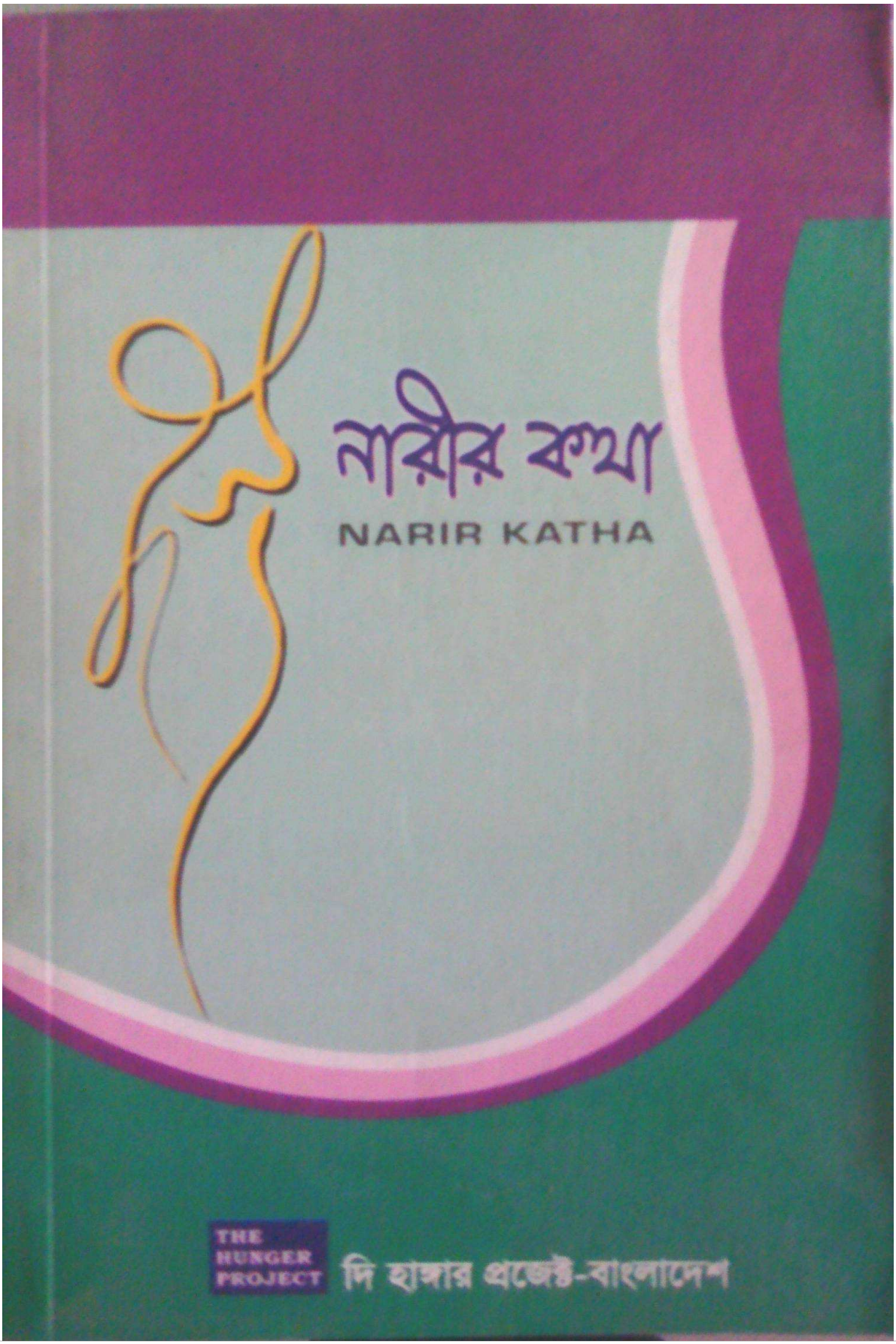
নারীর কথা
NARIR KATHA
THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা-৪

NARIR KATHA-4

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৯ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০০৯

THE HUNGER PROJECT দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা - ৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৯ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক	ড. বদিউল আলম মজুমদার
সহযোগী সম্পাদক	নাছিমা আক্তার জলি সরস্বতী রানী পাল
বিশেষ কৃতজ্ঞতা	শশাঙ্ক বরু রায়
প্রকাশক	**দি হাঙ্গার প্রজেক্ট** ৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ফোন: ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১-৬৮১২
সহযোগিতায়	জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
প্রকাশকাল	মার্চ ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ/ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
কপিরাইট	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
মুদ্রণ	ইনোসেন্ট প্রেস ১৩২, আরামবাগ, ঢাকা ফোন: ৭১০২৭৬৩

ISBN: 978-984-33-1474-1

Narir Katha - 4

(Collected writings on the occasion of International Women's Day)

Published by :

The Hunger Project-Bangladesh
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
E-mail: thpb@bangla.net
Web: www.thpbd.org, www.thp.org/Bangladesh

নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও আমাদের বিবেক

ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

কয়েকদিন আগে 'দৈনিক প্রথম আলো'তে 'বর, নাকি বর্বর!' শিরোণামে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের কদমতলি গ্রামে অনুষ্ঠিত ঘটনাটির বিবরণ, রিপোর্টারের ভাষায়, নিম্নরূপ: 'খাবারের তালিকায় অনেক কিছুই ছিল। পোলাওয়ের সঙ্গে গরু, খাসি ও মুরগীর মাংস, চিংড়ি মাছ, সবজি, সালাদ– সবই। ছিল না শুধু ডিম। এ নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বরযাত্রীরা। মেয়ের বাবা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, এক সঙ্গে ৭০০ লোকের খাওয়ার জন্য ডিম তিনি বাজারে পাননি।

'কিন্তু বরযাত্রীরা নাছোড়বান্দা। খাবারের সঙ্গে ডিম থাকার পাকা কথা হয়েছে। কাজেই ডিম তাদের চাই।

'শেষমেষ মুরব্বীদের মধ্যস্থতায় আপাতত ডিম-সমস্যার সমাধান হয়। বরপক্ষ ডিম না খেয়েই নববধূকে নিয়ে রওনা দেয়। বরের বাড়ী পৌঁছে বধূবরণ শেষ করতে না-করতেই শুরু হয় খোঁটা। নববধূ ও তাঁর পরিবারকে হেয় করতে চলতে থাকে আজেবাজে কথা। চলে গালাগাল। চোটপাট সবচেয়ে বেশি বরের নিজের। তাঁর ক্ষোভ যেন কিছুতেই মেটে না। এক পর্যায়ে নববধূকে বসিয়ে তাঁর মাথায় একে একে ১৯টা ডিম ভাঙেন বর নিজেই। ডিমের আঘাতে মাথা ফুলে অসুস্থ নববধূ এখন হাসপাতালে।' (প্রথম আলো, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

নিঃসন্দেহে ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের একটি অভাবনীয় রূপ ও জঘন্যতম দৃষ্টান্ত। তবে প্রথম আলোর ফলোআপ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীতে মো. হান্নান নামের এই দুবাই প্রবাসি বর তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কনেকে বাড়ী নিয়ে যায়। মনে হয় যেন জঘন্য ঘটনাটির পরিণতি আপাতত শুভ হয়েছে।

কিন্তু নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনারই পরিণাম শুভ হয় না। অনেকক্ষেত্রে তা হয় করুণ। তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল রংপুরের বদরগঞ্জ পৌর এলাকার শাহাপাড়া গ্রামে। এ ঘটনাটিও 'দৈনিক প্রথম আলো'তে 'যৌতুকের টাকার সামান্য কিছু বাকি ছিল বলে...' শিরোণামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টার আলতাফ হোসেন দুলালের ভাষ্য অনুযায়ী: 'দাবি করা যৌতুকের এক লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে নগদ এক লাখ বরপক্ষ পাওয়ার পর বিয়ে রেজিস্ট্রি করানো হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি। কথা হয়, বাকি ৬০ হাজার টাকা কনে তুলে দেওয়ার দুই দিন আগে দেবে কনে পক্ষ। এরপর উভয় পক্ষ বিয়ের কার্ডও বিলি করে।

'অনেক চেষ্টা করে কনের কৃষক বাবা ৪০ হাজার টাকা যোগাড় করে ২১ ফেব্রুয়ারি বরের বাড়িতে পাঠান। টাকা কম দেখে ক্ষুব্ধ হন বরের বাবা। কনের ভাইকে সাফ জানিয়ে দেন, বাকি ২০ হাজার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কনে তুলে আনবেন না। যেমন কথা তেমন কাজ! টাকা না পেয়ে বিয়ের নির্ধারিত দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি তালাক দেয়া হয় কনেকে।' (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

'দৈনিক প্রথম আলো'র একই সংখ্যায় (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) এ ধরনের নির্যাতনের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। মো. সুমন মোল্লার নামে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী: 'সৌদিফেরত রহমত আলীর সঙ্গে মাস চারেক আগে বিয়ে হয় তরুণীটির। কিছুদিন পর গর্ভে নতুন অতিথির আগমন টের পান তিনি। খবরটি স্বামীকে দিতেই খুশির বদলে তার চোখ-মুখে ফুটে উঠে বিরক্তির ছাপ। মুহূর্তেই রেগে ফেটে পড়ে স্বামী। শুরু হয় মারধর। তারপর চট্টগ্রামে যাওয়ার কথা বলে রহমত ১২ ফেব্রুয়ারি বিদেশে পাড়ি জমান।

‘ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার ওই নববধূর দুঃখের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। স্বামী চলে যাওয়ার পর তাঁর ভাইয়েরা কোন কারণ ছাড়াই তাঁকে বেদম পেটায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি জানান, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। এ কথা শুনে আরো ক্ষেপে যায় তারা। এরপর একের পর এক লাথি মারতে থাকে তাঁর পেটে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলে স্বামীর রেখে যাওয়া তালাকনামা তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বাবা-মা এসে ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।’ তাঁর পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে বলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নিশ্চিত করেন।

অনেকক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের পরিণতি মর্মান্তিকও হয়। তেমনি একটি কাহিনী ‘দৈনিক প্রথম আলো’র একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঝালকাঠি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত ‘স্ত্রী ও কন্যাকে জবাই করে আত্মসমর্পণ করলেন কমল!’ শিরোণামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঝালকাঠি সদর উপজেলার শতদলকাঠি গ্রামের কমল শীল (৩৮) তার সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রীতা রানী শীল (৩২) ও আট বছর বয়সী কন্যা বৃষ্টি শীলকে জবাই করে হত্যার পর থানায় আত্মসমর্পণ করেন। প্রতিবেশি ও স্বজনদের ভাষ্য মতে, নাপিতের পেশায় নিয়োজিত কমলের সাথে তাঁর স্ত্রীর প্রায় ঝগড়া হতো। সম্ভবত এ কারণেই তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে জবাই করে হত্যা করেন।

লক্ষণীয় যে, একদিনের একটি পত্রিকা ‘প্রথম আলো’তেই নারী নির্যাতনের তিনটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল নির্যাতনকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা। তাদের পেশা ভিন্ন। ধর্ম ভিন্ন। সামাজিক অবস্থানও ভিন্ন। অর্থাৎ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ব্যাপক এবং তা সমাজের সর্বস্তরে ও সর্বপ্রান্তে বিরাজমান। নির্যাতনের ধরনও বৈচিত্র্যময়। নির্যাতন শুধু শারিরীক সহিংসতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেকক্ষেত্রে তা মানসিক নিপীড়নেরও রূপ নেয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে রূপ নেয় খাদ্য-পুষ্টির মতো জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর সুযোগের বঞ্চনায়।

আরও লক্ষণীয় যে, প্রায় সকলক্ষেত্রে পরিবারই নারী নির্যাতনের প্রধান উৎস। পারিবারিক অঙ্গনেই নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রায় সকল ঘটনা ঘটে থাকে, যদিও রাষ্ট্র থেকেও ন্যায্য প্রাপ্য নারীরা অনেক সময় পায় না। নির্যাতনবিরোধী আইনি কাঠামোও নারীদের জন্য সহায়ক নয়।

মানসিক নিপীড়নের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর জন্য নির্যাতনকারীদের কোনো শাস্তি হয় না। শারিরীক নির্যাতনের জন্য থানা-পুলিশে যাওয়া যায়। আদালতে সহিংসতার অভিযোগ প্রমাণ করা যায়, যদিও তা অনেকক্ষেত্রেই দুরূহ। কিন্তু মানসিক নিপীড়নের কথা বায়বীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, তাই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীকে তা মুখ বুজে সহ্য এবং এর ক্ষত আজীবন বহন করতে হয়।

নারীর প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়ন নিঃসন্দেহে তাদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন করে – বাংলাদেশের সংবিধান নারীর কতগুলো অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছে। আরো ক্ষুন্ন করে তাদের সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সকল নারীরা নির্যাতিত হন তারা আমাদের সমাজেরই মানুষ, আমাদের কারো না কারোর আত্মীয়-স্বজন।

নারী নির্যাতনের পরিণতি শুধু নারীদেরকেই দিতে হয় না, এর মাশুল পুরো সমাজকেই গুণতে হয়। অপুষ্ট নারীরা স্বল্প ওজনের সন্তান প্রসব করে। স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত নারীরা রুগ্ন সন্তান পেটে ধারণ করে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত নারীদের সন্তান অশিক্ষিত থেকে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারী নির্যাতনের পরিণতি অনেক সময় ভয়াবহ এবং পুরো সমাজকে এর মাশুল গুণতে হলেও, এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা অনেকক্ষেত্রেই আমাদের বিবেককে নাড়া দেয় না – যদিও বিবেক হলো ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে বিভাজন করার সবচেয়ে বড় বিচারক। বস্তুত যুগ যুগ ধরে বিরাজমান পুরুষতন্ত্রের সংস্কৃতি আমাদের বিবেককে যেন ভোঁতা করে দিয়েছে। ফলে নারীর প্রতি নিগ্রহ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাদের বঞ্চনা অনেক সময় আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। অনেকক্ষেত্রে মনে হয় তা তাদের 'প্রাপ্য'। আবার অনেক সময় নারী নির্যাতনের ঘটনাকে অজুহাত হিসাবে আমরা 'পুরুষ নির্যাতনে'র ধূয়া তুলি, যদিও কালেভদ্রে তা ঘটে থাকে।

পরিশেষে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারী নির্যাতন আমাদের সমাজে ব্যাপক এবং বহুরূপে তা প্রতিভাত হয়। এ নির্যাতন আমাদের গা-সহা হয়ে গেলেও, তার পরিণতি আমাদের সকলকেই ভুগতে হয়। বস্তুত, নারীর প্রতি বঞ্চনা পুরো সমাজকেই বঞ্চিত করে – একটি সুন্দর উন্নত ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ থেকে। তাই জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে আজকে সকল সচেতন নাগরিককে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ। করতে হবে এর প্রতিকার। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

যে কথা যায় না বলা

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত)

নাছিমা আক্তার জলি, ডেপুটি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বা নারী নির্যাতন হলো দৈহিক, জৈবিক ও মানসিকভাবে নারীর ক্ষতিসাধন করে কিংবা করতে পারে এবং নারীকে তার অবাধ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এমন কোনো আচরণ, ভীতি প্রদর্শন কিংবা বল প্রয়োগের ঘটনা – তা ব্যক্তি জীবন অথবা জনজীবন যাকেই প্রভাবিত করুক না কেন।

জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নারী নির্যাতন বলতে সাধারণ অর্থে আমরা মারধর, শারীরিক অত্যাচার বা যৌন, নিপীড়নের যে গৎবাঁধা ধারণা বুঝি তার বাইরেও অনেকভাবে নারী নির্যাতিত হতে পারে। একজন নারী, শুধু নারী হওয়ার কারণেই শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম মানসিক বা মন পীড়নেরও শিকার হয়ে থাকে। যে পীড়ন কেবলমাত্র একজন নারীর ব্যক্তি জীবনের অগ্রযাত্রাকেই ব্যাহত করে না, ব্যাহত করে পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় অগ্রযাত্রাকেও।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ নারী। তাই নারীর উন্নয়ন ও সর্বস্তরে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। নারীর অস্তিত্ব যেখানে হুমকির সম্মুখিন হয়, তার স্বাধীনতা যেখানে খণ্ডিত হয়; বিশেষ করে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ যেখানে ব্যাহত হয়; সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নারীর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো বিকশিত হতে বেগ পায়। এরপরও বলা যায়, শত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক নারীই তার মনোবল হারায়নি। সাহসিকতার সঙ্গে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছেন। এর কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

কেস স্টাডি: এক

নওরীন সুলতানার ভাবনার জগতে এখনও একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন! প্রতিনিয়ত একই প্রশ্ন তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। প্রশ্নটি ছোট; কিন্তু এর স্পষ্ট কেনো উত্তর জানা নেই তার কাছে। তাই উত্তর খোঁজার নেশায় প্রশ্নটি করেছিলেন তারই এলাকার নারীনেত্রী দিপ্তী দাসের কাছে। প্রশ্নটি ছিল, "আচ্ছা বলুন তো – নারীরাও মানুষ কিন্তু একজন পুরুষের অধিকারগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ নারী সেই অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয় কেন?" দিপ্তীর কাছ থেকে তেমন কোনো সদুত্তর পান নি। বর্তমানে নওরীন নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত নারী, কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার আচমিতা ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি। তা সত্ত্বেও প্রতিনিয়তই তাকে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়।

পটুয়াখালী জেলার লেবুখালি গ্রামের মেয়ে নওরীন। বয়স তখন ১৫। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। বান্ধবীদের সাথে খেলা শেষ করে ঘরে ফিরতেই পাশের বাড়ির ভাবী এসে জানালেন এখনই শাড়ি পরতে হবে। আজ রাতেই তার বিয়ে। দুবাইপ্রবাসী পাত্র, কাজেই আর কেনো কথা নয়। রাতের অন্ধকারে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই নওরীনের বিয়ে হয়ে যায়। অনেকটা স্বপ্নের মতো। এটি আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। নওরীন এখন তিন সন্তানের মা। স্বামী প্রবাসেই থাকেন। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত স্বামী দেশে এসেছেন বার পাঁচেক। এরইমধ্যে নওরীন এসএসসি, এইচএসসি শেষ করে, বিএ পাশ করেছেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যৌথ পরিবারে সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালন, ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের পর নিজের লেখাপড়া চালানো – এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের আরও দশটি গতানুগতিক পরিবারের মতোই নওরীনের শ্বশুরের পরিবার থেকে পড়াশুনা করার জন্য কোনো সহযোগিতার হাত কখনোই সম্প্রসারিত হয় নি। বরং উল্টো কপালে জুটেছে কিছু অপবাদ। প্রবাসী স্বামীর নিকট প্রতিনিয়ত নওরীনের চরিত্র থেকে

শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসংখ্য অভিযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে দাম্পত্য জীবনেও তিনি অনেকবার হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন।

নওরীন এতে হাল ছাড়েন নি। তাকে এই জীবনযুদ্ধে জিততেই হবে। ২০০০ সাল। কটিয়াদিতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে নওরীন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে একটি মন্ত্র তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন – 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'। দ্বিতীয় বিশ্বাস জন্মেছে 'নারীর বাক্ স্বাধীনতা আছে, সিদ্ধান্ত নেয়ার ও দেয়ার ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্র/ধর্ম নারীকে এ সকল ক্ষমতা দিয়েছে'। নওরীন উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পরই আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ নেন। এ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নিজের আয় রোজগার একদিকে যেমন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে গ্রামের নারীদের সাথে তার সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। আচমিতা ইউনিয়নের নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হন। কিন্তু এ পর্যন্ত আসতে নওরীনকে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। নওরীন শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারই নন, একজন বলিষ্ঠ নারী নেত্রীও বটে। এছাড়াও তিনি ইউপি মহিলা ফোরামের জেলা সভানেত্রী। এরপরও পরিবার ও সমাজ থেকে তিনি সর্বদা এক ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকার। যা চোখে দেখা যায় না, শুধুই উপলব্ধি করা যায়। নারীর জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা, তা সত্ত্বেও নওরীন এগিয়ে চলেছেন...।

কেস স্টাডিঃ দুই

নদী এক সন্তানের জননী। সন্তান অথৈ এখন তার জীবনের একমাত্র থৈ। এসএসসি পাশ করতেই বিয়ে হয়ে যায় তার। ফেন্সিডিল আসক্ত স্বামী সোহেলকে প্রতিদিনই ৫০ টাকা করে মাদকদ্রব্য সেবনের জন্য দিতে হয়। যেদিন পারেন না সেদিনই নদীর ভাগ্যে জোটে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। নেশাগ্রস্থ স্বামী, নদীকে অন্যের হাতে পাচার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণে এতটুকুও দ্বিধা করে নি। যদিও সেবারে তিনি তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচান। একসময় নদীর স্বামী অতিরিক্ত নেশার কবলে পড়ে মারা যায়। নদী এখন নিঃস্ব। অভিজ্ঞতা নেই এবং চাকরির চাহিদামাফিক শিক্ষাগত যোগ্যতাও অনেকক্ষেত্রে কম। কিছু দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আছে। যা দিয়ে স্ব-কর্মসংস্থান করা যায়। কিন্তু কোনো পুঁজি নেই। নেই ঋণের জন্য কোনো গ্যারান্টার অথবা সম্পদ। ইতোমধ্যে এক বেসরকারি সংস্থায় চাকরি হয়েছিল প্রশিক্ষক হিসেবে। নদীর বয়স এবং চেহারা দুটোই কাল হয়ে দেখা দিল। বসের সুনজরে পড়ে গেল। বস প্রতিদিনই প্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দেন। কখনও মুখরোচক খাবার খাওয়ার, কখনও তার পোষাক, গায়ের রং কিংবা চেহারার প্রশংসা করে শপিং এ যাওয়ার প্রস্তাব দেন। অথবা বিশেষ প্রয়োজন দেখিয়ে ছুটির দিনে অফিসে আসার অনুরোধ। এছাড়া অসময়ে কাজের অজুহাতে নিজ চেম্বারে নদীকে আসতেও বলেন। নদীর কাছে তার এসব আচরণের ব্যাখ্যা খুবই স্পষ্ট। এরপরও নদী এই সত্য কথাগুলো সহকর্মীদের কাছে বলতে পারেন না। পাছে চাকরি হারানোর ভয়, অপবাদের ভয়। নদী তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকেন। সর্বদাই এক আতঙ্কের অন্ধকারে তিনি ঘুরপাক খেতে থাকেন। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন। অথচ চাকরিটি নদীর জন্য বড় প্রয়োজন। মাস গেলেই ঢাকার খিলগাঁয়ে ভাড়া থাকা একটি ঘরের জন্য মালিকের হাতে তুলে দিতে হবে ৩,০০০ টাকা। একদিকে সন্তান, নিজের জীবন অন্যদিকে চাকরি হারাবার ভয়ে মানসিক নির্যাতন। এক সময় নদী সিদ্ধান্ত নেন, প্রতিবাদের। দৃঢ়তার সাথে তিনি প্রতিবাদ করেন। নদীর এই দৃঢ়তার পেছনে শক্তি যুগিয়েছে ২০০৬ সালে নেয়া দি হাঙ্গার প্রজেক্টের নারী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ। নদী শুধু নিজের জন্য ভাবেন নি, ভেবেছেন আরো দশ জন নারীর কথা। তার মতোই ঐ সংস্থার চাকরিরত অনেক নারীকেই হয়তো এরকম মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে। শুধু মানসিকই নয়, হয়তো এটি গড়িয়ে শেষ পরিণতি হবে শারীরিক নির্যাতন। নদী চাকরি হারিয়েছেন। এক অজানা আশঙ্কায় নদী এখন ঘুরে ফিরছেন কবে কখন জুটবে একটি চাকরি? আবার অথৈকে নিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন।

কেসস্টাডিঃ তিন

লক্ষ্মী ওর নাম। সবাই বলে 'অলক্ষ্মী'। কারণ যেদিন লক্ষ্মী জন্মেছিলেন সেদিন দিদিমা উলুধ্বনি না দিলেও অনাদর করেন নি কখনও। জন্মমাত্রই লক্ষ্মী তার মা'কে হারিয়েছিলেন। পাড়া প্রতিবেশী তাকে অলক্ষ্মী বলে ডাকলেও দিদিমা তাকে লক্ষ্মী বলেই ডাকতেন। লক্ষ্মী বর্তমানে বগুড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে সিনিয়র নার্স হিসেবে চাকরি করেন। বৃদ্ধা বাবা ও দিদিমাকে নিয়েই লক্ষ্মীর সংসার। বাবা ব্লাড ক্যান্সারের রোগী। জীবনযুদ্ধে বাবাই তার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। তার জন্যেই লক্ষ্মী কষ্ট করছেন। এরপরও তার দুর্নাম ঘোচেনি নিজ গ্রামে 'অলক্ষ্মী' হিসেবে। বিয়ে বাড়ি, জন্মদিন অথবা যে কোনো সামাজিক উৎসবে গেলে পাড়া প্রতিবেশী এমনকি নিজ আত্মীয়-স্বজনও লক্ষ্মীর আগমনকে সহজভাবে নেন না। তাদের ধারণা লক্ষ্মীর জন্মই তার আজন্ম পাপ। তার জন্যই আজ তার বাবা-মার এই পরিণতি। লক্ষ্মী নিজের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করে জীবনের অঙ্ক মেলাতে চান। কোথায় তার দোষ? অসহ্য এক চাপা কান্নায় তার বুক ভেঙে যায়।

এখন বয়স তার ত্রিশের কোঠায়। সদর উপজেলার ঝোপগাড়ী গ্রামে এক শারদীয় রাতে তার জন্ম। জন্মক্ষণ, মাস কোনোটাই আর ভাবতে ভালো লাগেনা। লেখাপড়া, চাকরি সবই তার নিজের চেষ্টায়। বিয়ে? সেতো এক অলীক স্বপ্ন মাত্র। কারণ বুদ্ধির পর থেকেই জেনে আসছেন তিনি অপয়া। এই তো সেদিন! পিসিমার বড় মেয়ে জয়ার বিয়েতে গিয়েছিলেন। পিসিমা লক্ষ্মীকে দেখেই বলে উঠল, 'এই তুই জয়ার বিয়ের কোনো জিনিস ধরবিনে। বুঝিসতো, শুভ অশুভ বলে একটা কথা আছে।' লক্ষ্মী নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ঐ দিন পুরোটা সময় তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন এই ভেবে, সৃষ্টিকর্তা কেন তার মা'কে তুলে নিলেন ঐ মূহুর্তে। কেন দু'দিন পরে নিলেন না? অথচ লক্ষ্মীর কাছে মায়ের মৃত্যুর কারণ বাবা ও দিদিমা স্পষ্ট করে বুঝিয়েছিলেন, ভুল ছিল পরিবারের। অন্তঃসত্ত্বা মাকে ধনুষ্টংকার রোগের কোনো টিকা দেয়া হয় নি। প্রসবের সময় মা কোনো দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পান নি। তাই তার জন্মের সাথে সাথেই মা ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়, এরপর মারা যায়। মায়ের মৃত্যুই লক্ষ্মীর একজন নার্স হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা।

একদিকে মাকে না পাওয়ার কষ্ট অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মানসিক চাপ। মাঝে মাঝেই লক্ষ্মী হয়ে উঠেন দিশাহারা। এরপরেও তিনি ক্লান্ত নন। সমাজের এই কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ্মীকে ভাঙতেই হবে। এ যুদ্ধ চলবে, চালাতে হবে যতক্ষণ না মুক্তি। আলো আসবেই।

উপরে উল্লিখিত তিনটি কেসস্টাডি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর মানবাধিকার পর্যুদস্ত। আমাদের দেশে নারী শুধু শারীরিকভাবেই নিগৃহীত নয়, তারা মানসিকভাবেও অত্যাচারেরও শিকার। মানসিক প্রতিবন্ধকতাও নারীর পিছিয়ে থাকার একটি বিশেষ কারণ। দেখা যায়, যখনই কোনো নারী তার কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, তখন তাকে শুধু পারিবারিক বা সামাজিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও নানা বাধার সম্মুখিন হতে হয়। শুধু কটুবাক্যই নয়, নানা অপবাদেরও শিকার হতে হয় তাকে। এ সকল ঘটনা নওরীন, নদী বা লক্ষ্মীর জীবনেই নয়, এরকম ঘটনা হর-হামেশাই ঘটছে আমাদের নারীদের জীবনে।

পূর্ণ মানব মর্যাদায় জীবনযাপন করা নারীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এই মৌলিক চেতনাকে ভিত্তি করেই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ***'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'*** করা হয়। শুধু মানবাধিকার ঘোষণা নয়। ***'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদদের'*** **(সিডও)** নারীর অধিকার নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও প্রকৃত বাস্তবতা হচেছ, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াসই একটি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তাই কোনো বিশেষ শ্রেণির প্রতি বিরাগ বা বিরূপ মনোভাব নয় বরং আমাদের প্রয়োজন

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অংশীদারিত্ব। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে যে, নারীকে পেছনে ফেলে রেখে বা অবহেলা করে তাদের উপর মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে কোনোক্রমেরই একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠন করা সম্ভব নয়।

আমাদের বিশ্বাস, নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বসহ বাংলাদেশেও নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান হবে, সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ৮ মার্চ, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের নারী সমাজের এই হোক প্রত্যাশা।

আলোকিত আরতি

কাজী ফাতেমা বর্নালী

বিয়েবাড়ি মানেই একটু হৈচৈ, একটু আনন্দ। কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও কোথায় যেন বিষণ্নতার সুর। 'বিয়ে' মানে যদিও একটি মেয়ের জীবনে শুভস্বপ্নের সূচনা। কিন্তু এই স্বপ্ন সব সময় সবার জন্য শুভ হয় না। অন্তত আরতির জীবনে কথাটি খুবই সত্যি। বিয়ের পর থেকেই একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আরতিকে নানান প্রতিকূলতার বাধা পার হতে হয়েছে। সেই আরতি রায় এখন শুধু নিজের জন্যই না, বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

আরতির জন্ম ১৯৭২ সালের ১লা মে, বরগুনা জেলায়। পরিবারের চার ভাই দুবোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। ছোটবেলা থেকে বাবাকে খুব একটা কাছে পাননি আরতি। কাজের কারণে বাবা থাকতেন বরিশাল। আরতি যখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, তখন তার বাবা মারা যান। সংসারে মা এবং ভাইবোনদের সাথে দিন কাটতে থাকে আরতির। গ্রামে কিছু জায়গা জমি থাকায় আরতিদের পড়াশুনা করিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতে পারতেন তার মা।

নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্থানীয় কমিশনার বিশ্বনাথ ঘোষের ছেলে শঙ্কর ঘোষের সাথে আরতির বিয়ে হয়। বরপক্ষ প্রভাবশালী হওয়ায় অমত থাকার পরও মা ভাইরা বাধ্য হন শঙ্করের সাথে আরতির বিয়ে দিতে। আরতিও এই বিয়েতে রাজি ছিলেন না। আর এই রাজি না হওয়াটাই তার জীবনের বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিয়ের পরে আরতির স্বামী জানতে পারেন, বিয়ের আগে আরতি লোকজনকে বলেছেন, তিনি গুণ্ডা ছেলেকে বিয়ে করবে না। এই কথার জের ধরে প্রতিদিন মার খেতে হতো তাকে। শুধু তাই নয়, একান্নবর্তী পরিবার হওয়ার কারণে স্বামীর নির্যাতনের পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের হাতেও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হতো। বিয়ের এই তিন বছরের মধ্যে বাবাবাড়ির সাথে কোনো যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি তাকে। মাঝে মাঝে মায়ের পাঠানো গোপন চিঠিগুলোই ছিল তার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

এ রকমই এক চিঠিতে একবার আরতির মা আরতিকে আবার লেখাপড়া শুরুর পরামর্শ দেন। মা'র সেদিনের সেই পরামর্শ আরতিকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, অবস্থা বদলাতে হলে স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়, বরং তার সহযোগিতা নিয়েই করতে হবে। তারপর স্বামীকে একদিন লেখাপড়ার কথা বলতেই আরেক দফা গালমন্দ শুনতে হয় তাকে। এরপর অনেক কষ্টে তিনি তার স্বামীকে রাজি করান। কিন্তু কীভাবে পড়বেন? বইখাতা কোথায় পাবেন?

অবশেষে অনেক কষ্টে বইপত্র যোগাড় হয় তার। কিন্তু পড়ার সময় খুব সতর্ক থাকতে হতো আরতিকে। কেউ যেন জানতে না পারে, কেউ যেন বিরক্ত না হয়, তার জন্য কতই না চেষ্টা! তাই হারিকেনের চারপাশ কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে, মনে মনে পড়তে হতো তাকে। এভাবেই চলতে থাকে আরতির পড়াশুনা। তারপর মা ও প্রতিবেশী সাংবাদিক স্বপন দাসের সহযোগিতায় এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করেন তিনি। আর এভাবেই ১৯৮৯ সালে এসএসসি পাশ করেন। পরীক্ষা দেওয়ার কিছু দিন পর আরতির একটি পুত্র সন্তান হয়। বাড়িতে আনন্দের স্রোত বয়ে যায় তার সন্তান তুষারকে ঘিরে। আর সন্তান হওয়ায় কিছুটা যেন স্বস্তি পান আরতি।

শ্বশুরবাড়ির লোকজনও বংশের একজন উত্তরাধিকারী পেয়ে খুব খুশি। এই সুযোগে আরতি তার বাবার বাড়ির সাথে দূরত্ব কমাতে থাকেন এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনও অনুমতি দেয় সেখানে আসা যাওয়া করার। সবার আদরে মানুষ হতে থাকে একমাত্র সন্তান তুষার। ছেলেকে লালনপালন করা ও এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তায় সময় কাটতে থাকে আরতির। তার স্বপ্ন, লেখাপড়া শেষ করবেন তিনি। শুধু চিন্তা কীভাবে পরীক্ষা দেবেন! এ সময় একদিন আরতি জানতে পারেন প্রাইভেট পরীক্ষার কথা। কিন্তু ভয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কথাও কাউকে বলতে সাহস পান না। তারপর একটু সামলে উঠে আবার আগের মতো শুরু করেন লেখাপড়া। তিন বছর পর একইভাবে পরীক্ষা দিয়ে ১৯৯২ সালে এইচএসসি পাশ করেন।

এরপর থেকে আরতি তার ভেতরে এক ধরনের শক্তি অনুভব করেন। এখন আর তিনি দুর্বল নন, নিজের ভিত শক্ত মনে হয় তার। এই সময়ই বাড়িতে চলছিলো তার ছোট ননদের বিয়ের প্রস্তুতি। বিয়েতে শ্বশুড়বাড়ির কেউ তাকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু একজন মেয়ে হিসেবে আরতি বুঝতে পারেন, বিয়ে মানে অনেক খরচের ব্যাপার। আর সংসারের একজন সদস্য হিসেবে তারও যে দায়িত্ব আছে, সেটা তিনি অনুভব করেন। আর মনে করেন, আমার ননদ না হয়ে যদি সে আমার ছোট বোন হতো! তাই আরতি বাবার বাড়ি থেকে ২৫ হাজার টাকা যোগাড় করে তার শ্বশুরবাড়িতে দেন। ননদের বিয়েতে তার সাহায্যের ব্যাপারটি শ্বশুরবাড়ির লোকের চোখে পড়ে। তারা খুশিও হয়। আর এতে করে শ্বশুড়বাড়িতে তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। এই সময়ই আরতি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বিএ পরীক্ষা দেওয়ার। এবার অবশ্য তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি বাধ সাধেনি। এরপর তিনি সাফল্যের সাথেই বিএ পাশ করেন।

এবার আরতি ভাবেন, 'বিএ পাশ যখন করেছি, বসে না থেকে একটা চাকরি করি। এত কষ্টে অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগাই।' কিন্তু চাকরি করার কথা শুনলে তার স্বামী বা পরিবারের কেউ রাজি হয় না। আগের মতো শক্তভাবে বাধা না দিলেও সম্মতিও দেয় না কেউ। তা সত্ত্বেও ১৯৯৫ সালে পাথরঘাটা থানায় 'আশা' সংগঠনে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুপারভাইজার পদে যোগদান করেন আরতি। সেই থেকে তার কর্মজীবন শুরু। তারপর ১৯৯৮ সালে নিজের গড়া 'জাগো নারী' সংস্থায় কাজ করেন। এছাড়াও বরগুনার লোকাল এনজিও সংগ্রাম, কেয়ার বাংলাদেশ-এ কাজ করেছেন। বর্তমানে আরতি জিওবি ডানিডাতে কাজ করছেন। এই কাজগুলো করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে তাকে। যেমন: স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, জেন্ডার ও হিসাব, ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন, পিআরএ মনিটরিং, টোটাল স্যানিটেশন, রিফ্লেক্ট প্রশিক্ষণ, আইজিএ এবং নিড এ্যাসেসমেন্ট, অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং এবং মূল্যায়ন, সিডও সনদ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণও নিয়েছেন।

আরতি এখন কাজ করে যাচ্ছেন তৃণমূলের হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য। আর কাজ করতে গিয়ে, দেশের মানুষের এত কষ্ট দেখে নিজের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে আর বড় মনে হয় না। বরং তার কেবল মনে হয়, এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য সামান্য কিছুও যদি করতে পারি! তৃণমূলের মানুষের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি কাজ করছেন, তাহলো- স্যানিটেশন, হাইজিন প্রমোশন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরাধ, আইজিএ প্রশিক্ষণ দেওয়া, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, ইমাম সেশন, তরুণীদের উত্ত্যক্ত করা প্রতিরোধ টি স্টল এবং কমিউনিটি মিটিং, ইউনিয়ন ওয়াটসান মিটিং, নিরাপদ পানির ব্যাবহার, স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা তৈরি ইত্যাদি। এছাড়াও সামাজিক কার্যক্রমগুলোতেও সহায়তা প্রদান ও বিভিন্ন দিবসগুলোতে র‍্যালি, আলোচনা ও সামাজিক বিচার সালিশ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন কাজে অবদান রেখে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

এভাবে সামাজিক কাজগুলো করতে করতে একদিন এলাকার স্থানীয় উজ্জীবকদের কাছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'- এ নারীনেত্রী প্রশিক্ষণের কথা শোনেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল মানুষের বিকাশের জন্য এই প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। এরপর তিনি ২০০৭ সালে বরিশালে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'- এ ১২তম ব্যাচে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে তার চিন্তা-চেতনার বহু অজানা দিক উম্মোচিত হয় এবং জেন্ডার, নারী পুরুষের বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পান তিনি। প্রশিক্ষণের পর তার ভয় কেটে যায়। আগে তিনি কোনো কাজ করতে গেলে কোনো না কোনোভাবে পুরুষের দরকার। কিন্তু প্রশিক্ষণে তার বিশ্বাস জমেছে নারীরা সব কিছু করতে পারে। এই প্রশিক্ষণের পরই তিনি একটি সংগঠন তৈরি করেন ২০০৭ সালের জুলাই মাসে। সংগঠনের নাম দেন 'মাতৃমঙ্গল মহিলা উন্নয়ন সংস্থা'। এই সংগঠনের মাধ্যমেই এখন তিনি তার এলাকায় উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজগুলোর মধ্যে আছে, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে নিয়মিত উঠান-বৈঠক ও আলোচনা সভার আয়োজন, নারীর উন্নয়নভিত্তিক বিভিন্ন বই একত্রে পড়া, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, আরতি স্থানীয় মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন

বিষয়ভিত্তিক নাটকেরও আয়োজন করে থাকে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও জন্মনিবন্ধনের উপর নাটক করেছে তারা। আরতির ভাষায়, 'নাটকের মাধ্যমে সহজে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।' পত্তাখালি গ্রামের নাসিমা ও পৌরসভার সোনিয়ার মাত্র বারো বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। আরতির চেষ্টাতেই বন্ধ হয়েছে এ দু'টি বাল্যবিবাহ। পাশাপাশি এ বিষয়ে সচেতনতাও তৈরি করে যাচ্ছেন তিনি।

বরগুনার আরতী রায়। এক সফল মানুষের নাম। হাজারো কষ্টের মধ্যে ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে তার এই সফলতা। এখন আরতি নিজের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে শ্বশুরের ভিটেতে ঘর তুলেছেন। শুধু তাই নয় নিজের পরিবারকেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে দু'পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছেন তিনি। পাশাপাশি পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। হোমিওপ্যাথিক প্যারামেডিক্যালে পড়ছেন আর এলএলবিতে ভর্তি হয়েছেন। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা আরতির। এত কাজের পাশাপাশি চলছে পরীক্ষার প্রস্তুতিও। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আরতি রায়। সংগ্রামী এই নারী এখন স্বপ্ন দেখেন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশের। তার বিশ্বাস, বাংলাদেশের প্রতিটি নারীর সংগ্রামী মনোভাব থাকলে কোনো বাধা আর তাদের আটকাতে পারবে না ।

আসমা ও তার নারীকল্যাণ সংস্থা

কাজী ফাতেমা বর্নালী

কখনো কখনো এমন ঘটনাও ঘটে যাতে আশার স্বপ্নগুলো ধূসর ধূলিকণায় পরিণত হয়। জীবনের স্বাভাবিক গতি এমনি ভাবে বদলে যায় যেন হাল ছাড়া মাঝির মতো। এই জীবনে বেঁচে থাকাটাই তখন অর্থহীন মনে হয়। নিজের জীবনের চাকা থামিয়ে দেয়াটাই হয়ে যায় মূল লক্ষ্য। সেখান থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসে, কেউ যদি নিজের চেষ্টায় বিপর্যস্ত জীবনটাকে আবার সাজিয়ে নিতে পারে, তবে সেই মানুষের লড়াইটাকে সবাই মনে রাখে। আলমডাঙার হোসনে আরা আসমা এমনই একজন নারী।

চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি থানা আলমডাঙ্গা। কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসান নগর গ্রামে ১৯৭৬ সালে জন্ম হোসনে আরা আসমার। বাবা আজিজুর রহমান আর মা জাহানারা বেগম। ভাই বোনের মধ্যে আসমা ২য়। ছোটবেলা থেকেই খুব সাহসী ও চঞ্চলা প্রকৃতির। স্কুলে পিটি করা, খেলাধুলা করা যে কোনো বিষয়ে তার নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ছিল। বাবা-মা খুব বেশি লেখাপড়া জানতেন না, তাই মেয়ে আসমাকে লেখাপড়া শিখানোর আগ্রহ ছিল তাদের খুব বেশি । তাদের স্বপ্ন বড় হয়ে আসমা নার্স হবেন। সমাজের সকল মানুষের সেবা করবেন। আসমা প্রাইমারি শেষ করে আলমডাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এর মধ্যে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় পরিচয় হয় কামাল হোসেনের সাথে। অল্প দিনের পরিচয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাবা-মার কিছুটা অমতে তার বিয়ে হয় ১৯৯০ সালে।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ভালোই দিন কাটছিলো তার। স্বামী ও ভাসুর ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিলেন না । স্বামী কামাল ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী। এলাকায় মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ানোর কারণে সবাই তাকে ভালবাসতো। এসব দেখে খুব গর্ব হতো আসমার। ১৯৯৬ সালে তাদের সংসারে নতুন অতিথি আসে। বাবা মা মিলে নাম রাখেন আঞ্জুমান আরা লতা। লতার বয়স যখন এক, তখন এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয় আসমার জীবন। ১৯৯৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হন আসমার স্বামী।

আসমা কান্নাভেজা গলায় বলছিলেন ‘স্বামী আমার মাথার উপর ছায়ার মতো ছিলেন’। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে আসা হয় বাবার বাড়িতে। বাবার বাড়ির দিন যেন আর কাটতে চায় না। দিন দিন যেন সবার বোঝায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি ও তার মেয়ে লতা। এমনও দিন গেছে বাড়ির সকলেরই খাবার শেষ, কিন্তু তাকে খাওয়ার কথা বলছে না কেউ, তাকে ও তার মেয়েকে পরিধানের কাপড় দিতে গেলেও বাড়তি কাপড় দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছে। আবার এখান থেকে শ্বশুরবাড়ি থাকার জন্য গেলেও তারা বলে, তুমি ছোট মানুষ; তোমাকে কী করে রাখবো, তুমি বাবার বাড়ি চলে যাও। এভাবেই চলতে থাকে সময়। তাকে বা তার মেয়েকে কোনো রকম সহযোগিতার কথা বলেনি কেউ এ সময়। এক বছরের শিশুকে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। স্বামীর এত টাকা পয়সা ভাসুর ও স্বামীর কিছু বন্ধুবান্ধব মেরে খেয়েছে। সমস্য শুধু খাবার বা বেঁচে থাকাটাই নয়; বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো তার ‘অল্প বয়স’। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার কারণে তাকে গ্রামের কিছু ভদ্রলোকের কুনজরে পড়তে হয়। তারা নানান ভয় ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করে সব সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রাখতো আসমাকে। কত রাত মনে হয়েছে একটু বিষ খেয়ে নিজের ও মেয়ের জীবনটা শেষ করলেই বোধহয় মুক্তি। শুধু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শেষ করেনি আসমা। বরং এর শেষ দেখতে চেয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে আলমডাঙা শহরে আসেন তিনি। এখানেও বিপত্তি। কেউ তাকে বাসা ভাড়া দিতে চায় না। সুন্দরী বিধবা নারী বলে তাকে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। এ অবস্থায় তার নিজ গ্রামের শেফালী নামের এক নারী আলমডাঙ্গা শহরে তাকে বাসাভাড়া পেতে সহযোগিতা করে।

একদিন দেখা হয় গ্রামের পরিচিত আবদুস সামাদের সাথে। তারই সহায়তায় আলমডাঙ্গার 'হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স'-এ আসমার চাকুরি হয়। চাকুরির প্রথম বেতন পান মাত্র ৮০০ টাকা। এই নিয়ে তার খুশির কমতি ছিলো না। ঈদে মেয়ের জন্য সাবান, জামা কিনে নতুন সাহস সঞ্চয় হয়। এই ছোট্ট জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে গেল, কিন্তু হাল ছাড়া হয়নি তার। দু বছর চাকুরি করার পর মনে হলো লেখাপড়া করা দরকার। তারপর ১৯৯৯ সালে আলমডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ২য় বিভাগে দাখিল পাশ করেন। চলতে থাকে জীবন। এর মধ্যে 'রূপনগর' এনজিওতে কিছুদিন ঋণের কাজও করেছেন তিনি। মাসে ২৮০০ টাকা করে আয় হতো; কিন্তু দু মাস অসুস্থ থাকায় চাকুরিটা করা হলো না। ২০০৩ সালে *'উজ্জীবক'* নামে একটি সংস্থায় কাজ করেন তিনি। এই কাজ করার সময় প্রতিনিয়তই নিরাপত্তাহীন মনে হতো নিজেকে। যেখানেই কাজ করতে যান না কেন ভয় বা আতংক যেন তার পিছু ছাড়ে না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, জীবনে এমন একজন সঙ্গী দরকার যার সাহায্যে তিনি সমাজে নিরাপত্তা ফিরে পাবেন। এইসব ভাবনা থেকে আসমা দ্বিতীয় বিয়ে করেন, যাকে বিয়ে করলেন তিনি তার সব বিষয় জেনেই বিয়েতে রাজি হন। প্রথম অবস্থায় স্বামী খুবই সহযোগিতা করতে থাকেন। তখন বোঝা যায়নি, কিন্তু আস্তে আস্তে তার আসল মুখোশ খুলতে থাকে। আসমার দ্বিতীয় স্বামীর টাকার উপর লোভ ছিল খুব বেশি। তাই যে কোনো শর্তে আসমাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন। আসল রূপ প্রকাশের পর হতাশ হয়ে পড়েন আসমা।

এই হতাশা আর জীবনের কষ্টগুলো ভুলে থাকার জন্য সামাজিক কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এলাকায় তার নানান সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা দেখে পি ডি এফ সংস্থার মালিক এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের আলমডাঙা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম আসমাকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এ প্রশিক্ষণের কথা বলেন। আসমা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ২০০৭ সালে জুলাই মাসের ২৬-২৯ তারিখ আলমডাঙ্গায় দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ১২১৯তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণের সকল কথা যেন তার জীবনের সাথে মিলে যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন, মানুষ পারে, মানুষ সব করতে সক্ষম। নিজের আত্মশক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষ বড় হতে পারে, মানুষ একক প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় কিছু করতে পারে। তার মনে হয় নারীরা অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল, তারা অবহেলিত, অত্যাচারিত।

নারীর ভাগ্য নিয়তির উপর নির্ভরশীল নয়। এই বিষয়টির জন্য দায়ী সমাজ ও অবকাঠামো। আসমা নিজের ও অবহেলিত নারীদের নিয়ে ভাবতে শুরু করেন নতুন করে। শুরু করেন নতুন লড়াই। প্রশিক্ষণের পর একটি সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতে কাজ শুরু করেন। আসমা হাতের কাজ শিখেছিলেন, সেটিকে পুঁজি করে তৈরি করতে থাকেন জামা কাপড়, এরই পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে জনসচেতনামূলক কর্মকাণ্ড। আসমার ভিন্নধর্মী কাজ দেখে তার সাথে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেন দুজন, মিনারা ও রিতা। আসমার কাজ করার শক্তি বেড়ে যায়। কাজ করার জন্য আরো একটি সেলাই মেশিন মাসে দু'শত টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়। আলমডাঙ্গা পারকুলা গ্রাম থেকে টুকরা কাপড় এনে বালিশ ও লেপের কভার বানিয়ে আশেপাশের বাজারে সরবরাহ করতে লাগলেন। এই কাজে ক্রমেই সদস্য বাড়তে থাকে। তারপর তিনি ১০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। সম্মিলিতভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে দশ জনকে নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির নাম 'নারী কল্যাণ সংস্থা', তিনি সমিতির সভানেত্রী হন। গতবছর (২০০৮) রেজিস্ট্রেশনের পর এর নতুন নাম হয় 'দরিদ্র উন্নয়ন ও সামাজিক সংস্থা'। এই সংস্থার মধ্য দিয়ে আসমা তার সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

আসমা সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় উজ্জীবকসহ ৪২ জন নারীকে ব্লক-বাটিকের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে হোসনে আরা আসমার নেতৃত্বে ৩২ জন এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে আসমা স্থানীয় একটি সংস্থা থেকে ২২০০/- টাকা ঋণ নেন এবং সমিতির মাধ্যমে চারটা সেলাই মেশিন ভাড়া নেন। তিন মাসের মধ্যেই তিনি পুরাতন ৪টি সেলাই মেশিন কেনেন। আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন বাজার থেকে অর্ডারের কাজ নিয়ে শুরু করেন ব্লক-বাটিকসহ চুমকি

সুতার কাজ। এছাড়া পাঞ্জাবি, শাড়ি, ফতুয়াতে নকশা ও ফুল ওঠানোর কাজ। তারপর তা বাজারে বিক্রি করা হয়। এভাবে প্রথম বছর লাভ হয় ৭/৮ হাজার টাকা। নিজস্ব মূলধন ছাড়া অতি অল্প সময়ে স্বাবলম্বী হওয়া এবং আরো মেয়েদের এর সাথে জড়িয়ে নেওয়ার কারণে আসমা দ্রুত সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

আলমডাঙা থানায় এখন আসমা একটি অতি পরিচিত নাম। তার সমিতির প্রত্যেক সদস্য যেন পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে আর এই লক্ষ্যেই আসমা ও তার সংগঠন নিবেদিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আসমা এখন আলমডাঙ্গা উপজেলা জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদিকা পদে যোগ দেন। সামাজিক দায়িত্ব ও ব্যবসার পাশাপাশি যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে সব সময় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন এই নারী। আসমা নিজ এলাকাতে নয়, জেলার বাইরেও নিয়মিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং ফলোআপ সভা পরিচালনা করতে যান ।

এরই ফাঁকে তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স'-এর কথা জানতে পারেন। ২০০৭ সালে আগষ্ট মাসে কুষ্টিয়ার থানাপাড়ার রূপান্তর সম্মেলন কেন্দ্র মিশন স্কুলে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন আসমা। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নারী অধিকার, জেন্ডার, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা লাভ হয়েছে। প্রশিক্ষণের শেষে এলাকায় ফিরে গিয়ে নারীর আইনি অধিকার, নারী নির্যাতনে শালিশ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা ও উঠান-বৈঠক করে যাচ্ছেন। উঠান-বৈঠকের মাধ্যমে স্যানিটেশন সমস্যা, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছেন। এছাড়া নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন আসমা। তার উদ্যোগে বয়স্কদের জন্য ৩টি স্কুল চালু হয়েছে। উজ্জীবকরা এখন এই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।

আসমা এখন প্রত্যাশা করেন গ্রামের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য সমিতি থেকে একটা স্কুল করার। এছাড়াও বিভিন্ন দিবস পালন, সচেতনতার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন করা, নিয়মিত উঠান-বৈঠকসহ অন্যান্য কার্যক্রম তো চলছেই। আসমা এখন প্রায়ই বলেন, হাঙ্গার প্রজেক্টের সংস্পর্শে এসে আমি ব্যবসা করার মতো মনোবল ও সাহস ফিরে পেয়েছি। এলাকার যে সমস্ত মানুষ আগে তার কাজকে বাঁকা চোখে দেখতো এখন অনেকেই তার সমিতিতে সদস্য হয়ে ব্যবসার অংশীদার হতে চায়। আসমা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক অমিত সম্ভাবনা। শুধু পরিকল্পিত দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই তাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আসমা তার অতীতের দুঃখকে ভুলে গিয়েছেন। লতা নবম শ্রেণিতে পড়ে। আসমা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এখন তার স্বপ্ন লতাকে সঠিকভাবে মানুষ করা।

এখন আর হতাশা নয়, আসমা এখন স্বপ্ন দেখেন, আলমডাঙ্গায় এমন একটি বড় প্রতিষ্ঠান হবে, যেখানে অসহায় মেয়েরা কাজ করে খেতে পারবে আর পারবে নিরাপদ থাকতে। এর মধ্য দিয়ে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে, যা নারীদের জন্য পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। আমরা আশা করি, সে সমাজে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। আসমার লড়াই সেই স্বপ্নের বীজ আমাদের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছে। প্রতিটি ঘরে আসমার মতো নারী জেগে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিলকিস বানু : আঁধারে আশার প্রদীপ

সুব্রত কুমার পাল

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা এখনও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমাদের দেশে। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস আর আত্মশক্তি থাকলে যে নিজেকে বদলে ফেলা যায়, তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার সংগ্রামী নারী বিলকিস বানু।

বিলকিসের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন। একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলবেন। যে গ্রামের মানুষগুলো চিন্ত াশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের নিয়ে যাবে সম্ভাবনার শেষ প্রান্তে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, দারিদ্র্য তার সে স্বপ্নে আঘাত হেনেছে। দারিদ্র্য একটি অভিশাপ এটি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন বিলকিস বানু। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ পরিচালিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ' সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে বলে জানালেন ছত্রিশ বছর বয়স্কা বিলকিস বানু।

বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলার চামরুল ইউনিয়নের আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে চলা শান্ত ছোট গ্রাম জোহালি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দুই বছর পরই ১৯৭৩ সালে এ গ্রামে জন্ম নেন বিলকিস বানু। জন্মের পর বাবা নামে কাউকে ডাকার সৌভাগ্য হয়নি বিলকিসের। তিন মাস বয়সে বিলকিস বাবাকে হারান। পাঁচ ভাই ও চার বোনের মধ্যে বিলকিসই সবার ছোট। বিলকিসের বাবা মারা যাওয়ার পরে তাদের যে সামান্য জমি ছিল তা ভাইরা ভাগাভাগি করে নেয়। তার মায়ের ভাগে ছিল মাত্র ৮ শতক জায়গা। যার উপর একটি মাত্র ঘর করে বিলকিসকে নিয়ে থাকতেন মা। মা ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ধাত্রী।

বিলকিসের বাবা মারা যাওয়ার সাথে সাথে তাদের পরিবারে নেমে আসে এক ভয়াবহ সংকট। ভাই থাকলেও বিলকিস ও তার মাকে দিশাহারা হয়ে ঘুরতে হয় মানুষের দ্বারে দ্বারে। এদিকে বিলকিসের মায়েরও স্বপ্ন ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে একজন আদর্শ শিক্ষক বানাবেন। এ আশায় প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েকে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বিলকিস লেখাপড়ায় ভালই ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাকে একা রেখে মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বিদ্যালয়ে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। দেখারও কেউ ছিল না। বিলকিস তখন মেজোবোনের বাসায় আশ্রয় নেন। কিন্তু মেজোবোনেরও তখন খুব করুণ অবস্থা। দুলাভাইয়ের ছোট্ট ব্যবসায় যে সামান্য আয় হয় তা দিয়েই চলে সংসার। এই সংসারে একজন বাড়তি সদস্য তাদের কাম্য নয়। পরে বিলকিসকে মামার বাসায় নিয়ে আসা হয়।

মামার বাসায় থাকা অবস্থায় বিলকিসের জীবনে ঘটে যায় একটা বড় ঘটনা। মামা মোজাহার হোসেন বিলকিসকে এক কাঁচা মালের ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। সংসার ও স্বামী কিছুই যখন তার বোঝার বয়স হয়নি, তখন মাত্র তেরো বছর বয়সে বিলকিসের বিয়ে হয়। বিয়ের সাত বছর পর যখন তার সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে, তখন ঘটে আরেক ঘটনা। বিলকিসের স্বামী তখন তাকে না জানিয়ে আরেকটি বিয়ে করেন। বিলকিস এই ঘটনা জানতে পেরে কষ্ট পান এবং কোনোভাবেই তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাইদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ভায়েরা সদয় হয়ে তাকে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দেন।

বিলকিস তার সন্তানদের নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। অন্যের বাড়িতে কাজ করে, বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করে কোনোমতে দিনাতিপাত করছিলেন তিনি। চারদিক থেকে শুধু হতাশা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ করে খবর পেলেন, তার স্বামী তৃতীয় বিবাহ করেছেন এবং তাকে তালাক দিয়েছেন। এরপর বিলকিস মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। সংসার তছনছ হয়ে যায়। এ অবস্থায় বিলকিসের এক চাচাত বোন তার দায়িত্ব নেন।

তার বাড়িতেই রাখেন বিলকিসকে। তার দুই সন্তানের মধ্যে মেয়েকে তার মেজোবোন নিয়ে যান, আর ছেলেকে এক শাড়ির দোকানে কর্মচারী হিসেবে রাখেন। বিলকিসের জীবন চলতে থাকে আশ্রিতা হয়ে ।

দীর্ঘ পাঁচটি বছর ভাইয়ের বাড়িতে থাকার পর তিনি চিন্তা করেন, এভাবে বসে বসে আর কত দিন! একটা কিছু করা দরকার। শুরু হলো নতুন করে আবার পথ চলা। বোনের নিকট থেকে ১০০০ টাকা ধার করে শুরু করে জীবিকার সন্ধান। কিছু শাড়ি দোকান থেকে নিয়ে আসে। ঘরে বসে থেকে প্রথমে বিক্রি শুরু করলেন। শাড়ি বিক্রি করে যে সামান্য আয় হতো তা দিয়ে তার নিজের ব্যক্তিগত খরচ চলতো। এমনই এক সময় বিলকিসের পরিচয় হয় দুপচাচিয়া উপজেলার নারীনেত্রী পারুল বেগমের সাথে। এ-কথা সে-কথায় তার জীবনকাহিনী বলে ফেলেন। পারুল বেগম সব কথা জানার পর বিলকিসকে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালনায় রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'নারীনেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ' নেওয়ার কথা বলেন। বিলকিস এ প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হন। বাধা দেন বিলকিসের মেজোবোন। দুলাভাইকে রাজি করিয়ে বিলকিস ২০০৮ সালের ২৭-২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত ৩২তম ব্যাচে রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ নেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিলকিস নিজেকে আবিষ্কার করেন ভিন্ন জগতের মানুষ হিসেবে। তিনি ভাবতে থাকেন, এতদিন যে জগতে ছিলেন সেখানে এই সমাজের মানুষ নারীকে নারী হিসেবেই দেখতো, মানুষ হিসেবে নয়। তারা পায়নি তাদের ন্যায্য মানবিক অধিকার। প্রশিক্ষণ শেষে পরিকল্পনা করে, তার গ্রামকে কুসংস্কার ও অন্ধকারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার। বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো সামাজিক অভিশাপ থেকে গ্রামটিকে বাঁচানোর। পিছিয়ে পড়া নারীদের সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনাটিও বাদ যায়নি। বিলকিস জানান, আমাদের ঘর ছেড়ে রাজপথে নামতে হবে, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

তিনি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পাশের গ্রামের এক মেয়েকে বাল্যবয়সে বিয়ে দেয়ার খবর পেয়ে বিলকিস কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলে যান বাড়িতে। প্রথমে মেয়ের মা-বাবাকে বুঝানোর চেষ্টা করেও না পেরে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে জানালে তাদের সহযোগিতায় বিয়ে বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মেয়েটির পরিবার। এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশেপাশের গ্রামের প্রায় দশটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের কাজ করেই ক্ষান্ত হননি জোহালী গ্রামের নারীনেত্রী বিলকিস বানু। যৌতুকবিহীন বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতি সপ্তাহের বুধবার বিকেলে তার নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বৈঠক করেন। বিলকিস জানান, তিনি প্রতিটি প্রশিক্ষণের পর গ্রামে ফিরে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করেন।

নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য তারা 'মাটিহাস মহিলা সমবায় সমিতি' হিসেবে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমিতি গঠনের প্রথমদিক থেকে সপ্তাহে তারা ২৫ টাকা করে জমাতে থাকেন। বিলকিসের নেতৃত্বে প্রতি বুধবার তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ২০ জন নারীকে নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৬ জন। এ সমিতির বর্তমান তহবিল প্রায় ৫০ হাজার টাকা। সমিতির সদস্যরা সমস্যায় পড়লে এ তহবিল থেকে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয়, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু পালন করে তাদের সংসারকে আরো স্বাবলম্বী করেছেন।
এখন 'মাটিহাস মহিলা সমিতি' তার গ্রামে এক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। নারীর অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন শুধু এ সমিতির লক্ষ্য নয়। বিলকিস বানুর নেতৃত্বে এই সমিতির সবাই মিলে এ পর্যন্ত গ্রামে ৪টি বাল্যবিবাহ ও ৩টি যৌতুক নিয়ে বিয়ে বন্ধ করেছেন। সমিতির কার্যক্রম দেখে গ্রামের পুরুষ মানুষ অবজ্ঞা করলেও দিন বদল হয়েছে এখন। নারীদের এ পরিবর্তনের দৃশ্য দেখে পুরুষরাও আর থেমে নেই। উৎসাহ আর উদ্দীপনা বিরাজ করছে তাদের মাঝেও সমিতির কার্যক্রম দেখেই গ্রামের মানুষ এখন বুঝতে পারছেন, বাল্য বিবাহ, নিরক্ষরতা, যৌতুক আসলেই সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু। সমিতির

সদস্যরাও এখন আগের চেয়ে চিন্তা- চেতনায় অনেক অগ্রসর। সমিতির কেউ এখন গৃহিনী পরিচয়ে নয়, একজন মানুষ হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিতি পেতে চান।

বিলকিস বানু এখন পুরোপুরি স্বাবলম্বী ও আত্মসচেতন একজন মানুষ। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে শাড়ির ব্যবসার পরিধি বাড়িয়েছেন। শাড়ি বিক্রি করে তার এখন মাসিক আয় প্রায় ৭হাজার টাকা। তার ভাষায়, 'এখনও হয়তো আমি ফেরি করে শাড়ি বিক্রি করি, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমার একটি নিজের শাড়ির দোকান হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।' বিলকিস বানু এখন স্বপ্ন দেখেন নতুন জীবনের। হতাশার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে বিলকিস বানু এখন আঁধারে আশার প্রদীপ হয়ে জেগে আছেন।

আত্মবিশ্বাসী দোলনা

নীলুফার ইয়াসমীন নীলু

৪৫ বছরের একজন নারী। যার চোখে মুখে বার্ধক্যের ছাপের চেয়ে বেশি ছাপ পড়েছে তেজস্বিনীর তেজের আভা। বাজিগরের মতো জীবনযুদ্ধের প্রতিটি যুদ্ধে হারতে হারতে যে নারী জয়ী হয়েছেন। শৈশবে প্রতিটি মানুষই স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক কিংবা আরো অনেক কিছু হওয়ার। আকাশছোঁয়া সব স্বপ্ন। শৈশবে তেমনি স্বপ্ন দেখতেন করিমগঞ্জ থানার ক্ষুদির জংগল গ্রামেরমো. আ: গনি সরকার ও ফুলেন্নেসা বেগমের ছয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তান দোলনা আক্তার। স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে নার্স হবেন। অসুস্থ মানুষের সেবা করবেন। খুব অল্প সংখ্যক মেয়েশিশুই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আর বাকি সবাই সুবিধাবঞ্চিত নারী হিসেবে বেড়ে ওঠে। স্বপ্নগুলো তখন বাল্যবিবাহ নামক হিংস্র পশুর থাবায় ক্ষতবিক্ষত। তেমনি একজন নারী দোলনা। যে নারীর স্বপ্নগুলো অংকুরিত হওয়ার আগেই মিশে গেছে মাটির সাথে।

দোলনার জন্ম একটি অসচ্ছল পরিবারে। বাবা তেমন কিছুই করতেন না। ছয় সন্তানের মুখে তিন বেলা খাবার দিতে হিমসিম খেতেন পিতারমো. আ: গনি সরকার। তার উপর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া। কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারি পাশ করে করিমগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেন দোলনা। ছোট্টমেয়ের ছোট্ট মনে প্রতিবেশীদের জন্য অফুরন্ত মায়া। কারো কষ্ট দেখলে আকুল হয়ে কাঁদতেন দোলনা। এগিয়ে যেতেন একটু সহযোগিতা করার আশায়। এভাবেই কেটে গেল দুটো বছর।

অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হলেন দোলনা। বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকলো বাড়িতে। বাবা-মা দোলনার লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেন। করিমগঞ্জ থানার কাদির জংগল ইউনিয়নের জংগলবাড়ীর ইসলামপাড়া গ্রামেরমো. ফয়জুদ্দিনের বড় ছেলে মুদি দোকানদারমো. শামসুদ্দিনের সাথে তার বিয়ে দিলেন। পাত্র এসএসসি পাশ, বিপত্নীক ও এক কন্যা সন্তানের জনক। যৌতুক হিসাবে পাত্রকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বিয়ের রাতে ঘুম ঘুম চোখে কিশোরী দোলনা দেখলেন, তিনি শুধু আজ একজনের বৌ নন, তিনি একটি কন্যা সন্তানের মা'ও বটে। ঘরের বড় বৌ হওয়ায় প্রায় সব ধরনের দায়িত্ব দোলনার উপরে পড়লো। ছোটবেলা থেকেই বাবার বাড়িতে দেখে এসেছেন অভাব আর অভাব। স্বামীর সংসারে এসে আরো কঠিন অভাবের মুখে পতিত হলেন তিনি। নেত্রকোনা বাজারে ছোট্ট একটি মুদি দোকান ছিল তার স্বামীর। দোকানের আয় দিয়ে মাসে পনের দিনও চলতো না। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটতে লাগলো।

বিয়ের এক বছরের মধ্যে দোলনা অনুভব করলেন, তিনি মা হতে চলেছেন। তার শরীরে অন্য এক মানুষের উপস্থিতি। নয় মাস পর দোলনা জন্ম দিলেন একটি কন্যা সন্তানের। আদর করে মেয়ের নাম রাখলেন রানী। কিন্তু তার জন্য তো চাই অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের। বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে পারলেও অন্ন-বস্ত্রের যোগান দোলনা দেবেন কোথা থেকে! নিজেদেরই তো পেটে খাবার জোটে না। লোকসান হওয়ায় দোকানটা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে কোনো চাকুরি করার পরামর্শ দিলেন দোলনা তার স্বামীকে। যেহেতু এসএসসি পাশ করেছেন দোলনার স্বামী, সেহেতু ছোটখাট কোনো চাকুরি পেতেও পারেন সেই আকাঙ্ক্ষায় ঢাকা যেতে রাজী হলেন দোলনার স্বামী। ঢাকা যাওয়ার সময় দোলনা বেগম তার স্বামীকে বলেছিলেন যে, 'তোমার ভাগ্যের চাকা কেউ এসে ঘুরিয়ে দেবে না। তোমার ভাগ্যের চাকা তোমাকেই ঘুরাতে হবে।' দোলনার এ কথা দোলনার স্বামী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। দোলনার স্বামীও ঢাকায় এসে কোনো চাকুরি না পেয়ে হতাশার সাগরে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে দোলনার কানে, গলায়, হাতে যেটুকু স্বর্ণালংকার ছিল, তা বিক্রি করে মাত্র এক হাজার টাকা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন দোলনার স্বামী। ইতিমধ্যে প্রায় ছয়শত টাকা খরচ হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন দোলনার স্বামী কোনো একটা কাজের আশায়। দেখতে পেলেন, কিছু লোক রাস্তার পাশে ফুটপাতে বসে নানা রকম জিনিষপত্র বিক্রি করছে। তখন দোলনার স্বামী তিনশত টাকার জুতা কিনে বসে পড়লেন ফুটপাতে। এতে নাম মাত্র টাকা লাভ হলো। সে টাকা দিয়ে আবার জুতা-স্যান্ডেল কিনে ফুটপাতে বসে বিক্রি করলেন। এভাবে দিন যেতে লাগলো, সাথে টাকার পরিমাণও বাড়তে থাকলো। কিছুদিন পর দোলনার স্বামী ফুটপাতে একটি দোকান দিলেন। আয় রোজগার ভালই হতে থাকলো। দু মেয়েসহ দোলনাকে তার স্বামী ঢাকায় নিয়ে এলেন। ওদের তখন আর না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা ছিল না। সংসারে মোটামুটিভাবে সচ্ছলতা ফিরে এলো। আর ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগলো দোলনার স্বামীর ব্যবসায়। একে একে পাঁচটি কন্যা সন্তানের মা হলেন দোলনা। ইতোমধ্যে দোলনার স্বামী ফুটপাত ছেড়ে ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেটের দ্বিতীয়তলায় *রানী সুজ* নামে একটি পাইকারি জুতার দোকান দিলেন।

বস্তির ঘর ছেড়ে ভাড়া নিলেন একটা ফ্ল্যাট। সুখে দিন কাটছিল দোলনার। ১৭ বছর বয়সে বড় মেয়েকে বিয়ে দিলেন। বড় মেয়েটি সুন্দরী হওয়ায় বাজারের মধ্য দিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় বখাটে ছেলেরা তাকে বিরক্ত করতো। তাই মান-সম্মান যাওয়ার ভয়ে অল্প বয়সেই মেয়েকে পঁচিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর দ্বিতীয় মেয়েটির পালা। তাকেও একই কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বোনের ছেলের সাথে বিয়ে দিলেন। বিয়েতে রঙিন টিভিসহ ফার্ণিচার দিলেন যৌতুক হিসাবে। সবার কপালে নাকি সুখ বেশিদিন সয় না। ৬ষ্ঠ সন্তান জন্মদানের জন্য দোলনা ঢাকা থেকে শ্বশুরবাড়ি এলেন। এবার একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দিলেন।

দোলনাকে নিজ পৈতৃক বাড়িতে রেখে দোলনার স্বামী চলে গেলেন ঢাকায়। ঢাকা যাওয়ার পথে স্বামী অজ্ঞানপাটির কবলে পরে জ্ঞান হারান। পরে তার চিকিৎসা করে লাভ হয়নি। দোলনার স্বামী মারা যান। দোলনা তার সর্বস্ব বিক্রি করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না। স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি। চার মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে কী করে চলবেন তিনি। তিন রুমের একটা টিনশেড দালান ছাড়া একটা টাকাও তার স্বামী রেখে যেতে পারেননি। মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় চলতে থাকলো দোলনার সংসার। এতে করে একবেলা খাবার থাকে তো দুই দিন ঘরে খাবার থাকে না। এভাবে চলতে ভালো লাগছিলো না। নিজ ভাগ্য নিজেকেই গড়তে হবে। কিন্তু কী ভাবে? কোথা থেকে শুরু করবেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না দোলনা। এ দিকে দু মেয়ে সাথী ও রনি কৃতিত্বের সাথে অষ্টম শ্রেণিতে উঠল; কিন্তু লেখাপড়ার খরচ না দিতে পারায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল। স্কুল থেকে শিক্ষকরা সাথী রনির লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে তাদের স্কুলে ফিরিয়ে নিল।

এসএসসি পরীক্ষায় সাথী, রনি ভালো করলো। একদিন সাংবাদিক সাদেক আহম্মেদ স্বপনের কাছে দোলনা উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারলেন। এবং মেয়ে সাথীকে নিয়ে ২০০৫ সালের ১৩-১৬ আগস্ট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ৭৩৫তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন আলোচনাটি শুনতে শুনতে কেঁদেছেন অনেকবার। দোলনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও উজ্জীবক প্রশিক্ষকদের কাছে চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের দেশের প্রতিটি নারীর এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা হলে আর নারীদের কারো বোঝা হয়ে থাকতে হবে না। নারীরা সংসার ধর্মের পাশাপাশি ঘরে বসেই কিছু না কিছু আয় করতে পারবেন এবং সংসারে নিজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি ও নিজের একটি মত প্রকাশের অধিকার পাবেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর দোলনা করিমগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা চন্দ্রা সরকারের নেতৃত্বে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি। এ সমিতিতে ৩০ জন মহিলা সদস্য আছে। এরা সবাই মাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করে। এ সমিতির মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের টেইলারিং ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে সমিতিতেই অর্ডারি কাজ করানো হতো। দোলনা অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি থেকে দু হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাথী ও রনিকে কলেজে ভর্তি করালেন। কলেজেও সাথী, রনি শিক্ষকদের সহযোগিতায় লেখা-পড়া করতে লাগলো। দোলনা যখন রান্না করতে যেতেন

তখন প্রতিবার রান্নার চাউল থেকে এক মুষ্ঠি চাউল উঠিয়ে রাখতেন। এভাবে মাসে তার প্রায় তিন/চার কেজি চাউল জমা হতো। সেই চাউল বিক্রি করে প্রতিমাসে একটি করে মুরগী কিনতো। এভাবে ৫/৬টি মুরগি হলো দোলনার। মুরগিগুলোকে নিজের সন্তানদের মতো করেই যত্ন করতেন। বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গা ছিল না। যতোটুকু ছিল, সেখানে লাউ, সিম, বরবটি, পুঁইশাকের গাছ লাগিয়ে লতাগুলো উঠিয়ে দিতেন টিনের চালের উপর। ভালই ফলন হতো। আর যা ফলতো তা থেকে নিজের চাহিদা মিটিয়েও বাড়ির আশে-পাশের মহিলাদের কাছে বিক্রি করতেন দোলনা। ফলে সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে এসেছিল।

সাথী ও রনি কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশ করে। পাশ করার পর ইউনিলিভার- এ চাকুরি হলো। দু' বোনের মোট মাসিক বেতন হলো পনেরো হাজার টাকা। আর মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টি হলো। প্রতিদিন মুরগির ডিম দিয়ে নিজেদের চাহিদা মিটিয়েও ২/৩ হালি ডিম বিক্রি করেন দোলনা। ছোট দুমেয়ে ও এক ছেলে স্কুলে পড়ে। তার সংসারে অভাব নেই বললেই চলে। দোলনা ঘৃণা করেন যৌতুক প্রথাকে। সাথী ও রনীকে বিয়ে দিয়েছেন যৌতুক ছাড়াই। দোলনা সেবিকার সনদপত্র না পেলেও আজ একজন অভিজ্ঞ ধাত্রী। শুধু ধাত্রী হিসেবে নয়, একজন মমতাময়ী নারী হিসেবেও তিনি সকলের কাছে পরিচিত। তিনি নিজের খাবার তুলে দেন অনাহারীর মুখে। কারো উপকার করতে পারলেই যেন দোলনা মনে শান্তি পান। নারীদিবস ও কন্যাশিশু দিবসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আর প্রায়ই মনে মনে উচ্চারণ করেন,আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনোই দরিদ্র থাকতে পারে না।

আনোয়ারার সংগ্রাম চলছে

রোকসানা কনা

'আর কতকাল এভাবে কাটাব!'- দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলো বলছিলেন নোয়াপাড়া গ্রামের আনোয়ারা। নারী নেতৃত্ব বিকাশের ট্রেনিং- এর পর তার গল্প বলছিলেন আমাদের। ষাটোর্দ্ধ বয়স। দারিদ্র্য তাকে গ্রাস করেছে, তবু দেখছিলাম তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। বলছিলেন- 'তবুও ভাবি, যদি এমন কিছু করা যায়; যাতে দারিদ্র্য আর দুঃখের গভীর আঁধারে কোনো মেয়ের জীবন যেন হারিয়ে না যায়?'

মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগমের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। মা গৃহিনী। বাবা কৃষি কাজের পাশাপাশি ভেষজ ওষুধ তৈরি ও বিক্রি করতেন। এ দু থেকে অর্জিত অর্থ দিয়েই সংসার চলে যেত স্বচ্ছলভাবেই। নোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন তিনি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোতেই শেষ হয়ে যায় তার শিক্ষাজীবন। হাইস্কুল ছিল অনেক দূরে। নিরাপত্তার কথা ভেবে বাবা মেয়ে আনোয়ারাকে স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেননি। তাই পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হন তিনি। ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করতেন। পাশাপামি বাবার কাছ থেকে ভেষজ ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়াগুলো শিখতে থাকেন আনোয়ারা।

আনোয়ারা বয়স চৌদ্দ বছর। পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে হয় তার। স্বামী ঘোড়াশাল জুট মিলে চাকরি করতেন। চাকরির সুবাদে দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতেন তার স্বামী। ঘরের সব কাজ করেও শ্বশুর-শাশুড়ির মন জয় করতে পারেননি তিনি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আনোয়ারার ওপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন। আনোয়ারা পুত্র সন্তানের মুখ চেয়ে সব অন্যয়-অত্যাচার সহ্য করতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। শ্বাশুড়ি ও দেবরের উস্কানিতে স্বামীও অত্যাচার করা শুরু করেন। এরইমধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভবতী হন তিনি। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচারে বিপর্যস্ত আনোয়ারা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। নিরুপায় হয়ে বাবার হাত ধরে শ্বশুরালয় ত্যাগ করেন তিনি।

স্বামীর বাড়ি ছেড়ে এলেও দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। বাবার বাড়ি ফিরে আসা তার ভাইরা মেনে নেননি। এরমধ্যেই হঠাৎ মারা যান তার বাবা। শুরু হয় তার ওপর মানসিক নির্যাতন। আনোয়ারার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার ভাইরা তার দুই সন্তানকে তাদের দাদাবাড়ি পাঠিয়ে দেন। আনোয়ারার হাজারো অনুরোধ আর আর্তনাদেও তাদের মন এতটুকু গলেনি! এখানেই শেষ নয়। তারা ইচ্ছের বিরুদ্ধে আনোয়ারাকে দ্বিতীয় বিয়ে দেন।

আনোয়ারার দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি কোনো কাজ করতেন না। উপরন্তু আনোয়ারার কাছে টাকা চাইতেন। কারণে-অকারণে তাকে মারধোর করতেন, অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতেন। এমনকি তাকে বাবার বাড়ি আসতে দিতেন না। একে একে আনোয়ারা তিন পুত্র ও এক কন্যার জননী হন। সন্তানের ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব তার স্বামী পালন করতেন না। সংসার চালানোর জন্য আনোয়ারা মানুষের বাড়িতে কাজ করতে শুরু করেন। একইসাথে বাবার কাছ থেকে শেখা ভেষজ ওষুধ তৈরির কাজ করতে থাকেন। মূলত এই ওষুধ বিক্রির আয়েই তার সংসার খরচ চলতে থাকে। সন্তানদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হলেও তাদের সবাইকে স্কুলে পড়ানো সম্ভব ছিল না আনোয়ারার পক্ষে। তবুও তার আপ্রাণ চেষ্টায় সকলেই শেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা। এভাবেই অভাব- অনটনে সংসার চলতে থাকে। ১৯৯৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সৎছেলে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবারো ঘরহারা হন আনোয়ারা।

কিন্তু এবারও মনোবল হারান না আনোয়ারা। চার সন্তানসহ চলে আসেন কালীগঞ্জ। একটি ছোট বাসাভাড়া করেন। নতুনভাবে শুরু করেন ভেষজ ওষুধ তৈরি ও বিক্রির কাজ। জুটমিলের শ্রমিক হাসিন আলী ভুঁইয়াকে বিয়ে করে আবারও সংসার শুরু করেন। ১৯৯২ সালে ব্র্যাক আয়োজিত সেবিকা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। একইসাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

থেকে হাঁস-মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। নিজ গ্রামে সেবিকা হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করতেন। এছাড়া মডার্ন হারবাল কোম্পানি নামক একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ওষুধ কিনে স্থানীয় লোক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করেন। সংসারে সকলের অন্ন-বস্ত্রের যোগান দিতে হতো আনোয়ারাকেই। সংগ্রামী নারী সন্তানদের স্বাবলম্বী করে তোলেন। তিন পুত্র তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীর সেবা-যত্ন ও চিকিৎসার ব্যয় ভারও তিনি বহন করেছেন।

অভাব অনটনের সংসার সচল রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হত আনোয়ারাকে। সাংসারিক সকল কাজ আর কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন তিনি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি ভাবতেন সমাজের অসহায় আর অবহেলিত মানুষের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। বিশেষত নির্যাতিত নারীদের জন্য কাজ করার তাগিদ অনুভব করতেন তিনি।

গাজীপুরের নারীনেত্রী নাহিদ সুলতানার কাছে জানতে পারেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নানান কার্যক্রম ও সামাজিক উদ্যোগ বিষয়ে। নারীদের নানা কার্যক্রমের সফলতার চিত্র আনোয়ারাকে আগ্রহী করে তোলে। ২০০৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় অফিসে আয়োজিত দ্বিতীয় নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তার মনে হয়েছে, আরো আগে সুযোগ পেলে তা তার জীবনের চলার পথে অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা রাখতো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চনার স্বীকার হতে হতো না। নিজের অধিকার আদায়ে তিনি অন্যকে বেশি সচেষ্ট হতে পারতেন।

আনোয়ারা অর্থনৈতিকভাবে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে চান। তিনি স্বামীর উন্নত চিকিৎসা করাতে চান। একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চান। তিনি মনে করেন, তার মেধা আর দক্ষতা রয়েছে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান পেলে তিনি সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবেন। আনোয়ারা সমাজের অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করার কাজে ভূমিকা রাখতে চান। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিপীড়িত নারীদের কল্যাণের কথা সর্বদা অনুভব করেন।

এলাচি কথন

তুহিন আফসারী

সকাল থেকেই ব্যস্ত সময় কেটে যাচ্ছে। আজ গ্রামের দুই প্রান্তে দুটি গণশিক্ষার স্কুল শুরু হবে। বিকালে আবার নব দম্পতিদের *'ছোট পরিবার'* বিষয়ক কর্মশালা আছে। এর ফাঁকে ফাঁকে কারো বা পারিবারিক সমস্যা, কারো-বা সাংসারিক ঝামেলা কারো বা অন্য ধরনের কাজ। হরেক রকমের ব্যস্ততায় কেটে যায়। ব্যস্ততার এই ভিড়ে ক্লান্তি আর অলস সময়ে পিছন ফিরে দেখলে এখনো দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে। মনের কোনে জমে থাকা যন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আর যাই হোক দুঃসহ সেই অতীতকে এখন আর ভাবতে চান না তিনি। এখন শুধু সামনে এগিয়ে চলা। আসুন, এগিয়ে চলা এই নারীর সংগ্রামী জীবনের সাথে আমরা পরিচিত হই।

কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরে জগতি ইউনিয়নের ঢাকা ঝালোপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের হাতেম আলী মন্ডল ও আমেনা বেগমের বেশ বড় সংসার। তাদের আট সন্তান। হাতেম আলীর মহিষের ব্যবসা ও সামান্য কিছু জমির আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলে। বড় এই সংসারে অভাব না থাকলেও টানাটানি ছিলো। সন্তানদের মধ্যে হাতেম আলীর নজরটা একটু বেশি থাকতো তৃতীয় মেয়েটির উপর। বাবার আদরে বেড়ে ওঠা শান্ত স্বভাবের মেয়েটির নাম রাখা হয় এলাচি। মেয়েটির পড়াশুনাতেও আগ্রহ একটু যেন বেশি। তাই বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দুরে জগতি প্রাইমারী স্কুলে নিজে গিয়ে এলাচিকে ভর্তি করিয়ে দেন হাতেম আলী। কৃতিত্বের সাথে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করলে এলাচিকে ভর্তি করানো হয় কে এস এম হাইস্কুলে। বাবার খুব আগ্রহ থাকলেও চাচা ও প্রতিবেশীদের কেমন যেন মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যায়। সংসারের ও সমাজের বদনামের ভয়ে চাচা ও প্রতিবেশিদের চাপে হার মানেন হাতেম ও আমেনা। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় একই গ্রামের বিনোদ আলী মণ্ডলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় এলাচিকে। স্বামী বিনোদ আলীর যোগ্যতা বলতে মাঠের জমি আর চাষাবাদ।

বিয়ের পর তিন মাসের মতো সময় জোর করে শশুরবাড়িতে রাখা গিয়েছিল এলাচিকে। মেয়ের কান্নাকাটি আর জেদের কারণে হাতেম আলী গিয়ে কথা বলেন এলাচির শ্বশুর ইমান আলী মন্ডলের সাথে। শ্বশুরের নিমরাজি মনোভাবের পরও হাতেম আলী আবার মেয়েকে নিজের কাছে এনে স্কুলে ভর্তি করে দেন। পড়াশুনা চলতে থাকলো আবার নতুন করে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর আবার তৎপর হয়ে ওঠে সব চাচা, প্রতিবেশি আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সবার এই চাপ আর ঠেকানো যায়নি। আবার চোখের পানিতে ফিরে আসতে হয় শ্বশুরবাড়িতে। এসময় এলাচির সহপাঠিরা বাড়িতে এসে সমবেদনার পাশাপাশি এলাচির চোখের পানিও দেখে যেত। এই চোখের পানি কোনো ভাবেই মন গলাতে পারেনি তাদের, যারা তার পড়াশুনা বন্ধ করেছিলো।

শুরু হয় এলাচির সংসার যাপন। স্বামীর অমতে পড়াশুনার কারণে স্বামীও পর হতে শুরু করে এলাচির। এদিকে কৃষিজীবি পরিবার হওয়ার কারণে সংসারে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো। অল্প বয়সে পরিশ্রম ও মানসিক নির্যাতনের কারণে শারিরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বিয়ের ছয় বছরের সংসারে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। কন্যাসন্তান। সন্তান প্রসবকালীন সময়ে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পরের দুটি সন্তান মারা যায়। পরে আবার কন্যাশিশুর জন্ম হলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্বামী। নির্যাতনের মাত্রা বাড়ার পাশাপাশি যোগ হয় দ্বিতীয় বিয়ের হুমকি। শুধু হুমকি দিয়েই থেমে থাকলেন না এলাচির স্বামী। কিছুদিন পর দ্বিতীয় বিয়ে করে তার ক্ষমতাও দেখিয়ে দিলেন। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের পর তিন মাসও টিকতে পারেননি এলাচি। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ এলাচিকে তার বাবা একরকম জোর করে নিজের কাছে এনে রাখেন। বাবার বাড়ি চার মাস থাকার শ্বশুরবাড়ি থেকে ভাসুর, শ্বশুরসহ অন্যান্যরা এসে এক রকম সালিশ বিচার করে আবার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যান এলাচিকে। এর পর কেটে গেছে দশ বছর। এতটা সময় শুধু দুই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন স্বামীর ঘরে। দশ বছর পর টিকতে না পেরে চলে আসেন বাপের বাড়িতে।

স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার সময় ছোট মেয়ের বয়স দুই আর বড় মেয়ের বয়স দশ। বাবার বাড়িতে আসার পর বাবা এবং বড় ভাই মিলে কিছু জমি দেন এলাচিকে। সেই জমিতে বাবার তুলে দেওয়া ঘরে নতুন জীবন শুরু হয় এলাচির। এখানের এসে কান্না যেন শেষ হয় না এলাচির। বোনের যন্ত্রণা দেখে মেজ ভাই পরামর্শ দেন সমিতি তৈরি করার। এই ছাপড়া ঘর থেকেই এলাচি গড়ে তোলেন নির্যাতিত নারীদের নিয়ে 'পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র'। প্রাথমিক অবস্থায় সদস্যা সংখ্যা কম থাকলেও এক পর্যায়ে এর সংখ্যা দাড়ায় ২৫০জন। কিছুদিনের মধ্যে সদস্যারা মাসিক দশ টাকা হারে চাঁদা দিয়ে সঞ্চয় গড়ে তোলেন প্রায় ৪,০০০/- টাকা। সংগঠন গড়ে তোলার পর স্থানীয় এক দর্জি মাষ্টারের সহায়তায় এলাচি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তার এই কাজ দেখে প্রথম অবস্থায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন সমাজপতিরা। পরে এক মিটিং- এ আমন্ত্রণ জানানো হয় এলাকার সমাজপতিদের। এলাচি তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, শিশুর বেড়ে ওঠা, মায়েদের স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানিসহ নানা সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কাজ করছেন। কাজের এক পর্যায়ে ১৯৯৫ সালে সংগঠনটি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন ভুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় স্থানীয় এনজিও সেতু এই কাজে সহায়তা করে।

এই কাজের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসের (FPAB) কর্মকর্তা আকরাম হোসেনের সাথে পরিচয় এলাচির। তার সংগঠনের কাজ দেখে তিনি এলাচির সংগঠনে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দেন। সংগঠনের এই অফিসের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে এলাকার নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও ওষধ প্রদান করা হতো। আকরাম হোসেনর চেষ্টায় এই কাজের সুনাম ঢাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। ফলে ঢাকা থেকে পরিবার পরিকল্পনা অফিসের (FPAB) এর মহাসচিব কাজী আনিছুর রহমান কুষ্টিয়া আসেন সংগঠনটির কার্যক্রম দেখতে। পাড়াগাঁয়ের এই সংগঠনটির কাজ দেখে অনুদান দেওয়া হয় নগদ ৪০,০০০/- টাকা। এটাই এলাচির প্রথম স্বীকৃতি। স্থানীয় সবার সহযোগিতায় কাজ চলতে থাকে এলাচি ও তার সংগঠনের। আর এর মাধ্যমে নিজের দুঃখকষ্ট ভুলতে থাকেন এলাচি।

কাজ করতে গিয়ে অনেকের সাথেই পরিচয় ও সখ্য গড়ে ওঠে এলাচির। এর মধ্যে 'কথাসংস্থা'র নির্বাহি পরিচালক মফিজুর রহমানের কাছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন এলাচি। সংগঠন ও তার কাজের ধরনের কথা শুনে একটু আগ্রহ তৈরি হয় তার মধ্যে। এই সময়ে কুষ্টিয়ার রূপান্তর মিশন স্কুল কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় ১২১২ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণের। সেটা ছিলো ২০০৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। জুলাইয়ের ১৭ থেকে ২০ তারিখে এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক বিষয়ে গোছানো জ্ঞান লাভ করেন এলাচি। এছাড়া জ্ঞানের রাজ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রত্যাশার অনুশীলন, ক্ষুধামুক্ত এলাকার বৈশিষ্ট্যসহ গোটা প্রশিক্ষণই ভালো লাগে এলাচির। অনেক অজানা বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া ছাড়াও লড়াইয়ে টিকে থাকার মন্ত্রে দীক্ষা হয় তার। প্রশিক্ষণটি গ্রহনের পর গোটা কাজের ধরনে পরিবর্তন আসে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর একই বছর কুষ্টিয়া রূপান্তর কেন্দ্র থেকে ১৫ তম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশ গ্রহন করেন। নারীনেত্রীত্বের এই প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করার পর নিজের ভিতরের ক্ষমতাটা আরেকবার টের পেলেন এলাচি। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর নারী পুরুষের অসমতা, বৈষম্য, নারী অধিকার, নারী আইন, নারীর অগ্রগতির ইতিহাসের পাশাপাশি নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয় তার মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে লালন করতে থাকা যন্ত্রণাটি আবারো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার নিজের মতো দুর্ভাগ্য আর কারো জীবনে যেন না আসে, সেই চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেন এলাচি।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর একই সাথে অনেকগুলো কাজ শুরু করেন এলাচি। এলাকাতে নিজের সমমনা সাথী তৈরি করার জন্য আয়োজন করেন ১৩৭৬ ও ১৪২৮ তম ব্যাচের দুটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষিত উজ্জীবকদের নিয়ে শুরু হলো

অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ। এপর্যন্ত ৯০ জন নারীকে সেলাই শিখিয়েছেন, যাদের অধিকাংশই এখন আয় করে। কারচুপির কাজ শিখিয়েছেন ২৫ জন নারীকে। ৫০ জনের দুটি ব্যাচে মায়েদের প্রশিক্ষণ করিয়েছেন শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে। অসুস্থ নারীদের হাসপাতালে চিকৎসাসেবা নিশ্চিত করতে নিয়মিত উদ্যোগ নেন। এছাড়া পারিবারিক সচেতনতা তৈরির জন্য গড়ে উঠেছে *নব দম্পতি* নামে সংগঠন, যেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও নারী নির্যাতনসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা আলাপ হয়।

অনেক বন্ধু এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাদের সাথে কথা বললে এখনো কষ্ট হয় এলাচির। খুব আগ্রহ থাকার পরও নানা প্রতিকূলতার কারণে বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তাই এলাকার সব বয়সের মানুষের লেখা ও পড়া নিশ্চিত করার জন্য গ্রামের দু এলাকাই দুটি গণশিক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার- এর লিডার পারুল, সাথী, লিমা, মাসুমা টগর পালাক্রমে স্বেচ্ছায় এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে। এলাকার স্কুলগামী শিশুদের স্কুল গমন নিশ্চিত করা জন্য ফিডার স্কুল নামে একটি স্কুল গড়ে তুলেছেন। প্রতিব্যাচে চার বছর বয়সী ত্রিশ জনের ব্যাচ তৈরি করে ছয় বছর পর্যন্ত পড়ানো হয়। শুধু তাই নয় এখান থেকে বের হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিকটবর্তী স্কুলে ভর্তির বিষয়ে সহযোগিতা করেন এলাচি।

এখন পারিবারিক দ্বন্দ্ব, নির্যাতন, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান এলাকাতেই হয়। প্রতি সপ্তাহে ‘পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র’ অফিসে আয়োজন করা হয় উঠান বৈঠকের। এলাচির উদ্যোগে গঠিত নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি নিয়মিত এলাকার এসমস্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলে। এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাসে চারটি করে উঠান বৈঠক হয়, যেখানে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, কন্যাশিশুসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা হয়। এলাচি ইতিমধ্যে তার সংগঠনের মাধ্যমে তার এলাকাকে স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য ৫৫ টি পরিবারের মধ্যে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ করেছেন। নারীদের সংগঠিত করার জন্য গড়ে তুলেছেন *অংকুর মহিলা উন্নয়ন সমিতি* ও *তারা মহিলা সংস্থা*। মাসে মাসে পাঁচ টাকা হারে সঞ্চয় করা অংকুরের সদস্য সংখ্যা ১৫৭ জন। হস্তশিল্প, নক্‌শিকাঁথা ও হাতের কাজ করে এখান থেকে প্রতি মাসে ৩৫ জন মেয়ে অর্থ উপার্জন করে। এর থেকে তুলনামূলক বড় সংগঠন *তারা মহিলা সংস্থার* সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। সংগঠনটির সদস্যারা মাসিক ২০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। এখান থেকেও হস্তশিল্প, নক্‌শিকাঁথা ও হাতের কাজ করে এখান থেকে প্রতিমাসে ৫৫ জন মেয়ে উপার্জন করে।

নিজেকে নিয়ে এখন আর ভাবনা নেই এলাচির। সংগঠন ও সামাজিক কাজ করার পর যতটুকু সময় পান তা নিজের সংসার ও বাগানে ব্যায় করেন। বাগানে ২৫০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ লাগিয়েছেন। নিজের সংগঠনের সদস্যদের দিয়ে আরো লাগিয়েছেন ২৫০০ গাছ। এলাকার পুলিশিং কমিটি, ভিজিএফ কার্ড বিতরণ কমিটি, জেলা দুর্বার, জেলা মানবাধিকার কমিটির সদস্য হিসেবে ব্যস্ত সময় কাটে তার। এছাড়া কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের জগতি ইউপি কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফোরাম ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র যৌথ ভাবে এলাকায় কন্যাশিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারীদিবস, রোকেয়া দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ বিভিন্ন দিবস পালন করে। এলাচির স্পর্শে আজ জেগে উঠছে জগতির ঢাকা ঝালোপাড়া গ্রাম।

এখন অনেকেই আসে এলাচির কাছে। আসে স্বামীও। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আবার নিয়ে যেতে চান তার সংসারে। কিন্তু এলাচি এখন সারাদেশের নির্যাতিত নারীদের নিয়ে তার জগৎ গড়েছেন। এত বড় দায়িত্ব রেখে অন্য চিন্তা করার সময় কোথায়!

এক নিরলস নারী সংগঠক

মো: আবুল বাশার ও মীর ফরহাদ হোসেন সুমন

বিশাল একটি চটের ওপর গোল হয়ে বসে ২৫-৩০ জন নারী গল্প করছেন। চেহারা-পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও তাদের বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। তাদের অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে, তারা এমন কিছু করছেন– যা নিশ্চিত সাফল্য বয়ে আনবে। কথাবার্তা ও তাদের আচরণে মনে হচ্ছে, তারা শুধু বাহ্যিকভাবে নয়, অন্তর্গতভাবেও সংগঠিত। দূর থেকে তাদের দিকে যে কেউ তাকালে বুঝতে পারবে– এমনি এমনি তারা বসেননি, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো এজেন্ডা নিয়ে আলোচনার জন্য তারা জড়ো হয়েছেন। তখন বিকেলবেলা। এটি ছিল ৩০ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে তাদের নিয়মিত আলোচনা সভা।

লক্ষ্মীপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে পিয়ারাপুর গ্রাম। রামগতি রোডের স্বর্ণকারবাড়ি। ইউনিয়নের নাম ভবানীগন্জ। সীতা রানী কুরী এই গ্রামেরই বাসিন্দা। দিনের নির্ধারিত বিষয় আলোচনায় স্থান পেলো। সেদিনের বিষয় ছিলো 'হাঁস-মুরগির বাচ্চা ফোটানো ও তৎপরবর্তী যত্ন' এবং 'রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ও করণীয়'। অংশগ্রহণমূলক ও প্রাণবন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সেদিনের সভা শেষ হলো। সভা শেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পাশের একটি আবাদি জমিতে। জমির পরিমাণ কাঠা দশেক। সেখানে সীম ও কফির চাষ হয়েছে। ফলনও ভালো। কথা বলে জানা গেলো বেশ লাভজনক। সবজি চাষে সাফল্যের পেছনে আছে এই পাক্ষিক সভার অবদান। কারণ, এই সভাতে নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য নিজস্ব পুঁজি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে যা যা করা যায় তার ব্যাপারেও আলোচনা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী নারীদের অনেক সময় সরকারী-বেসরকারি বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ ও টেকনিক্যাল সেবা দেয়ারও ব্যবস্থা করা হয়।

বর্ণিত ঘটনাটি একটি খণ্ডিত চিত্র। এর সার্বিক চিত্র ভৌগোলিকভাবে এমনকি তথ্যগতভাবেও অনেক বড়। এসব কাজ যে মানুষটির নিরলস চেষ্টায় ঘটে চলছে তার নাম সীতা রানী কুরী। তার কর্মকাণ্ড দেখার তাগিদ থেকেই সেদিন আমরা হাজির হয়েছিলাম তার গ্রামে। আসুন, আমরা পরিচিত হই তার সঙ্গে।

লক্ষ্মীপুর শহরে বসন্ত কুমার কুরী ও শান্তিবালা কুরীর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন সীতা রানী কুরী। ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি। ৮ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট তিনি। 'লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' ও 'লক্ষ্মীপুর হাই স্কীম গার্লস স্কুল' থেকে ১৯৮৩ সালে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৮৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারেননি। আনুষ্ঠানিক পড়ালেখার পাঠ এখানেই শেষ করে লক্ষ্মীপুর ত্রিধারা কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৮৯ সালে লক্ষ্মীপুরে জীবনবীমা কর্পোরেশনে ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত বিজন বিহারী ঘোষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে এবার FPAB তে চাকরি শুরু করেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্ভ্রান্ত শ্বশুরবাড়িতে শুরু হয় সীতা আর বিহারীর দাম্পত্য জীবন।

শ্বশুড়রবাড়িতে পরিবার ছিলো ১৪টি। ধ্যান-ধারণা ছিলো মান্ধাতার আমলের। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ওই বাড়ির সনাতন আচার-আচরণে কোনো ছাপ মেলেনি তখনো। সীতার শ্বশুর, ভাসুর, জা ছিলেন শিক্ষক। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনাচরণে সেকেলে ভাবনা! জীবনাচার ছিলো এমন যে– বউরা জুতা পরতে পারবে না। চলাফেরাও ছিলো নিয়ন্ত্রিত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকতো। মেয়েরা শীতকালেও চাদর পরতে পারতো না-পারিবারিক বিধি-নিষেধের কারণে। শ্বশুরালয়ের এ পরিবেশ সীতাকে কেমন যেন অস্থির করে তুলতো। চাপা ক্ষোভ ও যন্ত্রণা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো।

কী করে এই বিধি-নিষেধের দেয়াল ভাঙ্গা যায়– এ নিয়ে একদিন কথা বলেন স্বামী বিজন বিহারী ঘোষের সঙ্গে। স্বামী বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে এগুলো পাল্টাতে পারো। ঘাটে যখন বাড়ির বউরা সব একত্র হবেন তখন তুমি তাদের বোঝাবে।' কথা মতো কাজ। বাড়ির বউরা সবাই যখন ঘাটে স্নানের জন্য জড়ো হতেন, সীতা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নানা বিধি-নিষেধ ভাঙ্গার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাতেন। তারাও সীতার কথামতো নিজেরা পরিবারের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনলেন। প্রথম প্রথম সামান্য সমস্যা হলেও পরে সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

আপনার তৎপরতা বাড়ির বাইরে গেলো কী করে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সীতা বললেন, 'আপনার দাদা বললেন, বাড়ির ভেতরে একটা পরিবর্তন তো হলো, এবার বাড়ির বাইরে একটা পরিবর্তনের দরকার।' স্বামীর এই কথা শুনে সীতা ভাবলেন, এই কাজের জন্য শ্বশুরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা দরকার। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ করলেন সীতা। কথায় কাজও হলো। কিন্তু কীভাবে বাড়ির বাইরের নারীদের সঙ্গে একটা নিয়মিত যোগাযোগ করা যায়। যোগাযোগ হলে কাজের ভিত্তিই বা কী হবে। তাছাড়া কী করেই বা নারীদের পরিবর্তন সূচিত হতে পারে– এরকম নানান চিন্তা থেকে সীতা একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সংগঠন তৈরির পেছনে সীতা যেসব বিষয়কে যুক্তি হিসেবে দেখতেন তা হলো:

'পুঁজি গঠন করা দরকার। অর্থ থাকলে মেয়েরা নিজেরা অনেক কাজ করতে পারে। অসুখ-বিসুখ হলে অনেক সময় বাড়ির লোকজন চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহী হই না। সেক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্য থাকলে মেয়েরা নিজেদের চিকিৎসা করাতে পারবে। স্বাবলম্বী নারী মানে সম্মানিত নারী।' অর্থাৎ নারীর অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের করেছিলেন সীতা। অবশ্য এ জায়গায় আসতে তার সময় লেগেছে দীর্ঘ ৪ বছর। চেষ্টা করে ১৯৯৩ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'পিয়ারাপুর বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন সমিতি'। সদস্য সংগ্রহ করেন ১০৩ জন। সবাই নারী। সংগঠনের নারীরা প্রতিমাসে ২২ টাকা করে জমা দেন সীতাকে। ১৯৯৬ সালে মহিলা অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নেন। বর্তমানে সমিতির তহবিলে আছে প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

সংগঠনের নারীরা সমিতির জমা টাকা থেকে পুঁজি নিয়ে বাঁশ বেতের কাজ শুরু করে। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সীতা তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিতেন। বিপণনের জন্য নিজে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কথাবার্তা বলতেন। তাছাড়া কেউ কেউ মুড়ি ভেজে বাজারে বিক্রি করা শুরু করেন। এই কাজটি এখনো চালু আছে। এভাবে সদস্য নারীরা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ তৈরি করেছেন এবং আগের তুলনায় ভালো আছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিন জন নারী ৫,০০০-১০,০০০ টাকা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। বর্তমানে এই তিনজনই স্বাবলম্বী।

সীতা এই পর্যায়ে উপলব্ধি করলেন, সংগঠনের নারীদের শিক্ষাদান দরকার। সীতা রানী কুরী, রেফাত শাহীদা ও ফাতেমা- এই তিনজন মিলে সংগঠনের ১০৩ জন নারীকে লেখাপড়া শেখান। তারা সবাই এখন লিখতে-পড়তে ও হিসাব-নিকাশ করতে পারেন। এছাড়াও সংগঠনের মোট পুঁজি থেকে গরু-ছাগল ক্রয় করে সদস্যদের পালতে দেয়া হয়। যা থেকে তারা লাভবান হচ্ছেন।

সীতা এভাবে 'পিয়ারাপুর বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন সমিতি'র নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কোথায় যেন একটা গলদ অনুভব করছিলেন। নারীরা তো আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে; কিন্তু নারী হিসেবে তার সম্মানতো অর্জন হচ্ছে না। তা-ই নয়, সম্মান যে প্রয়োজনীয় এবং তার জন্য নারীর সক্রিয়তা দরকার– সেটিও তাদের উপলব্ধিতে আসেনি। এই পরিস্থিতি সীতাকে ভাবিয়ে তোলে। তাহলে কি নারীর জন্ম শুধু সংসারে দাসী হিসেবে থাকার জন্য?

এমন সময় ২০০৭ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য আফসানা খাতুন রোজীর কাছ থেকে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ পান সীতা রানী কুরী। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ১৬তম প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে অনেক পুরনো প্রশ্নের সমাধান বের করতে সাহায্য করে সীতাকে। তার ভাষায়, 'প্রশিক্ষণের পর আমি নতুন করে অনেক রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। ১৩/১৪ বছর ধরে আমি সমাজ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে আসছি। এই প্রশিক্ষণটা আগে পেলে আমি অনেকটা বেশি কাজ করতে পারতাম। তারপরও বসে থাকিনি একদিনও। আমার চোখের অনেকগুলো পর্দা সরে গেছে। আমি সমাজকে নতুন করে দেখতে পারছি। যে জায়গাটিতে আমাদের যাওয়া দরকার সেটিও আমি দেখতে পাই।'

এরপর সীতা আর বসে থাকেননি। সীতা এবার নারীর মানসিকতা পরিবর্তন ও সমাজে নারীর বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলো দূরীকরণের জন্য নতুন করে কাজ শুরু করেছেন। আগের একমুখী কাজকে বহুমাত্রা দেয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন তিনি। ২০০৮ সালেই তিনি মোট ৫টি নারীদের সংগঠন বা গ্রুপ গঠন করেছেন। গড়ে তোলা সংগঠনের ঠিকানা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সংগঠন গঠনের তারিখ	ইউনিয়নের নাম ও ঠিকানা	নারী সদস্য সংখ্যা
১.	১০/০৮/০৮	ফতেহ আলী হাজীবাড়ী, দক্ষিণ পিয়ারাপুর ১৭নং ভবানীগন্জ ইউনিয়ন, সদর লক্ষ্মীপুর	২৫ জন
২.	১১/০৮/০৮	স্বণকারবাড়ি, উত্তর পিয়ারাপুর ১৭নং ভবানীগন্জ ইউনিয়ন, সদর লক্ষ্মীপুর	২৫ জন
৩.	৩০/১০/০৮	ডা: সোলেমানবাড়ি, পিয়ারাপুর ১৫নং লাহারকান্দি ইউনিয়ন, সদর লক্ষ্মীপুর	২৫ জন
৪.	২৬/১০/০৮	কমর আলী পাটোয়ারীবাড়ি, কুমিদপুর ১৫নং লাহারকান্দি ইউনিয়ন, সদর লক্ষ্মীপুর	২৫ জন
৫.	২৯/১০/০৮	কর্মকারবাড়ি, আব্দুল্লাপুর ১৭নং ভবানীগন্জ ইউনিয়ন, সদর লক্ষ্মীপুর	২৫ জন

এই গ্রুপগুলোতে ১৫ দিন পর পর একটি সভা হয়। সভাতে আলোচনা করেন সীতা রানী কুরী। সীতা গ্রুপের নারীদের কর্মমুখী হওয়ার জন্য প্রণোদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বললেন, নানা ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ যেমন, হাঁস-মুরগী পালন, সবজি চাষের ব্যাপারে নারীদের উৎসাহিত করি। এসকল কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় এনজিওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি ওই নারীদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য প্রতি বৈঠকে বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, মা ও শিশুর পুষ্টি থেকে শুরু করে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণে যে বিষয়টি আমাদের বোঝানো হয়, তা আমি এই সভাগুলোতে আলোচনা করি।

এভাবেই গ্রুপগুলোর কাজ সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন সীতা রানী কুরী। এসব কাজের পাশাপাশি তিনি তার নিজ গ্রামে কিংবা আশপাশের গ্রামে পারিবারিক কোনো কলহের খবর পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হন। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে কলহ দূর করার চেষ্টা করেন এই নারীনেত্রী। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'অমীয়দের (ছদ্মনাম) বাড়িতে অমীয় প্রায়ই তার বউকে মারধর করতেন। আমি অমীয় ও তার বৌকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। এখন তারা সুখেই আছেন।'

এসব কাজের ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের গ্রুপের নারীদের স্বামীরাও খুশি। তাছাড়া ওই মেয়েরা কেউ বসে থাকেন না। সংসারের কাজের পাশাপাশি কেউ সবজি চাষ করে, কেউ হাঁস-মুরগি পালন করেন। এসব কারণে তাদের কিছু উপার্জনও হয়। এতে করে সংসারে একটা পরিবর্তন আসছে।' ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে জানতে চাইলে সীতা বলেন, যদি আগের ৫টি গ্রুপের কাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখতে পাই, তবে নতুন আরো কয়েকটা গ্রুপ গঠনের কথা ভাববো। আর এসব গ্রুপের কাজের খোঁজ-খবর রাখার মাধ্যমে এই সমাজের একটি ইতিবাচক অবস্থা তৈরি করাই আমার ভবিষ্যত প্রত্যাশা। সংসারের কাজের পাশাপাশি এই সামাজিক কাজগুলো নিয়ে থাকতে পারলেই আমার জীবনটা সার্থক বলে জানালেন তিনি।

গ্রামীণ নারীদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন সীতা। যার মধ্যে একটি গ্রুপের একদিনের কর্মকাণ্ড আমরা শুরুতে বর্ণনা করেছি। আসুন আমরাও সীতা রানী কুরীর মত সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করি, তাহলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে পারবো।

এক স্বাবলম্বী নারীর একান্ত কথা

মাজেদুল ইসলাম

আমার নাম মর্জিয়া আক্তার রুনা। আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ পৌরসভার আয়লা গ্রামে। করিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ ইউনিয়নের সিংগুয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। তিন ভাই, তিন বোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। আমার শৈশব কেটেছে অনাবিল আনন্দে। বন্ধুদের সাথে খেলেছি, গাছে চড়েছি, বরই পেরেছি– কত আনন্দের ছিল সেই দিনগুলি। আমি এখনও একাকিত্বে আমার শৈশব, কৈশোরকে আলিঙ্গন করি। আমার ভাল লাগে। ১৯৯৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছিলাম। যৌবনের উচ্ছলতায় ভেসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলাম। আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে একবার অকৃতকার্য হলে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার উকিল হবার স্বপ্নের মৃত্যু হলো। তবে আমি ব্র্যাক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে তাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিলাম। টানা তিন বছর কাজ করলাম।

পারিবারিক সিদ্ধান্তে ১৯৯৯ সালে কুড়ি হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে আমার বিয়ে দেয়া হলো বাবার বাড়ির পার্শ্ববর্তী আয়লা গ্রামে। স্বামীর ছয় ভাই তিন বোনের বড় সংসার। সংসারে দারিদ্র সব সময়ের সঙ্গী। বিয়ের পর স্বামী আমাকে বলল, 'তুমি সুখ পাবে এমন কিছু এই সংসারে নেই। এই সংসারটিকে তুমি তোমার মনের মত করে সাজিয়ে নাও। আমার যদি সহযোগিতার দরকার হয়, আমাকে বলবে।' বলে রাখছি, আমার স্বামী আল আমিন, রাজশাহী শহরে ২৭ বছর ধরে একটি দোকানে মাসিক বেতনে চাকুরি করে। পারিবারিক প্রয়োজনে বা অনুষ্ঠানে কালেভদ্রে বাড়িতে আসে। স্বামীর কথার পর আমার সংসার সাজানোর কাজ শুরু হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ সবাই আমাকে আপন করে নিল। এটি আমার সংসার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। অল্প অল্প করে কিছু টাকা জমানো শুরু করলাম। স্বামীকে বললাম, 'আমাকে একখন্ড জমির ব্যবস্থা করে দাও। আমি শাক-সবজির চাষ করতে চাই'। স্বামী আমার চাওয়া পূর্ণ হবে বলে আশ্বাস দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আমার জমানো টাকা ও কিছু লোন করে প্রথমে ১০ শতক ও পরে ৫ শতক জমি ক্রয় করলাম। এই ১৫ শতক জমিকে আমার এবং আমার সংসারের জন্য ফলবান বৃক্ষে পরিণত করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে শুরু করলাম। পরিশ্রমের ফল পেলাম। ১৫ শতক জমিতে শাক-সবজি আবাদ করে অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জমিয়ে বাঁকি টাকা দিয়ে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করলাম। সবজি বিক্রি করে প্রায় এক লক্ষ টাকা জমলো। এই টাকা, স্বামীর কাছ থেকে নিলাম চল্লিশ হাজার টাকা এবং কিছু ঋণ নিয়ে আরো তিন কাঠা জমি ক্রয় করলাম।

আবার শুরু হলো চাষাবাদ। একদিকে সবজি চাষ চলছে, অন্যদিকে বাবার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা, ভাইয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা, মায়ের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা এবং ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার ঋণ নিয়ে আরো ১.৫০ কাঠা জমি কিনলাম। জমির পরিমান বাড়লো, পরিশ্রমের মাত্রাও বাড়লো। একজন নারী হয়েও আমি প্রতিদিন জমিতে পরিশ্রম করেছি। আমার এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রেরণা দিল উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। ২০০৮ সালে আমার বন্ধু উজ্জীবক নীলুর মাধ্যমে জানতে পারলাম করিমগঞ্জের উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৩৬৩তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। নারীর ক্ষমতায়ন পর্বে আলোচনায় মনে হলো যেন প্রশিক্ষক আমার এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকেই উপস্থাপন করছেন। আমি অনুপ্রাণিত হলাম।এখন আমাদের দুজনার মোট সম্পত্তি ৭ কাঠা। লিজ নিয়েছি আরো ৩.৫০ কাঠা। এখন বৎসরে 'কু ফসিল' চাষ করে খরচ বাদে মুনাফা থাকে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। আমাদের এলাকায় সবজি চাষকে 'কু ফসিল' বলে। জমিতে আমন ধানের আবাদও করি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে সকল বলা অপূর্ণ থেকে যাবে। আমার মনের গভীরে একটি অনুভূতি সবসময় আমাকে আন্দোলিত করে, তা হলো আমার মাতৃত্ব। আমার দু'টি মেয়ে। বড় মেয়ে ইভা, বয়স ছয় বছর এবং ছোট মেয়ে মোহনা, তিন বছর বয়স। আমার সকল স্বপ্ন এখন ইভা এবং মোহনাকে ঘিরে। কল্পনায় দেখি, আমার বড় মেয়ে ডাক্তার হয়েছে এবং ছোট মেয়ে হয়েছে পুলিশ অফিসার।

সবার সহযোগিতায় আমার এগিয়ে যাওয়া। এখন পারিবারিক যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারে সবাই আমার মতামতের দিকে চেয়ে থাকে। পারিপার্শ্বিক কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা আমার গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারে না। আর আমি ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরতে ভালবাসি। পুরো পরিবারের ভার এখন আমার উপর।

এখন তিনি এলাকার সফল নেত্রী

সিদ্দিক রুবেল

নারীকে অবদমিত, ক্ষমতাহীন করার মধ্য দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রচনা করা হয়েছিল নানা রকমের বিধি-বিধানের। নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল সেই সব বিধানের মূল ভিত্তি। নিপীড়িত নারীরাই নিষ্ঠুর নিয়মের সেই অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার সংগ্রাম শুরু করেছিল। মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা যে সংগ্রাম সেদিন শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা আজ অবধি বহমান। এখনও শত শত নারী সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সমতার পৃথিবী নির্মাণের সাহসী সংগ্রামে লিপ্ত। বিউটি হক সেই সংগ্রামের মিছিলে সামিল হওয়া সাহসী এক যোদ্ধা।

কন্যাশিশুর জন্মই তো অপ্রত্যাশিত এ সমাজে। তাই হয়তো ১৯৭৬ সালের মে মাসের কোনো এক বিষণ্ন বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ৩নং ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় তার জন্ম। দুই বোন চার ভাইয়ের সংসারে তিনি ছিলেন সবার বড়। পিতা জহুরুল হক ছিলেন ব্যবসায়ী। সব মিলিয়ে মোটামুটি সচ্ছল ছিল তাদের পরিবার। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া আর খাওয়া পরার অভাব হয়নি কখনও। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের অধিকারী ক্রিসেন্ট কিন্ডার গার্ডেন স্কুল থেকেই তার শিক্ষাজীবনের শুরু হয়। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালোই ছিলেন তিনি। শিশুবয়সে পড়াশুনায় আগ্রহ ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের কারণে তার পরিবার এবং শিক্ষকরাও তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বৈশাখের আকাশ যেমন হঠাৎ করে কালো মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ করেই এলোমেলো হয়ে যায় তার জীবনটা, তখন তিনি সবেমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রেখেছেন । পিতার বন্ধু ভালো একটি ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কন্যাদায় মুক্তির এমন সুযোগ হারাতে চাননি তার পিতা।

১৯৮৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর চৌদ্দ বছর বয়সের বিউটির সাথে বিয়ে হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের চিফ অপারেটর গোলাম মোস্তাফা চৌধুরীর। বিয়ের সময় যৌতুক দিতে না পারার কারণে শ্বশুরবাড়িতে তেমন সমাদর হয়নি তার। বিয়ের পর স্বামীর সহযোগিতার কারণে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্লাস নাইনের ছাত্রী থাকাকালে সন্তানের জন্ম হওয়ার পর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি। মা হওয়ার আনন্দের পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল তার জন্য। তার স্বামী গোলাম মোস্তাফা চৌধুরী পড়ে গিয়ে হাড়ে চোট পান, অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেও পরে হাড়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং ১৯৯২ সালের ১৯ শে জুন তিনি মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর অল্পবয়সী বউকে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে অপরাগতা প্রকাশ করেন শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন পিতার আশ্রয়ে। পিতার ব্যবসায় বিপর্যয় হওয়ায় সেখানেও তার অবস্থান দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেকারণেই তার নিজের এবং সন্তানের ভরণ পোষণের খরচ যোগানোর জন্য কাজে নামতে হয় তাকে। তখন সারাদিন সেলাই শেখা এবং রাত জেগে সেলাই করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মা ও সন্তানের খরচ নির্বাহের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

অবশেষে নাজমুন নাহার আপার প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নন ফরমাল প্রাইমারি স্কুলে তার ৪৭৫ টাকা বেতনে শিক্ষকের চাকুরি হয়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার পাশাপাশি নিজের ভেতরেও লেখাপড়া শেখার একটা আকাঙক্ষা তৈরি হয়। যথাযথ প্রস্তুতি ও পড়াশুনা করার সুযোগ না পেয়েও প্রাইভেটে ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন তিনি। ফলাফল শুধু অল্পের খারাপ হয়। সহকর্মীরা তাকে হতাশ না হয়ে আবারও পরীক্ষা দেওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন।

সেই সময় পৌরসভার উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডে আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ চলছিল। বিউটি স্কুলে কাজের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার উপর ২১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়ে মাসিক ২০০ টাকা সম্মানীতে কাজ শুরু

করেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানা ধরনের রোগের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, হতদরিদ্র মানুষদের নিয়ে সমিতি গড়ে তোলা। সমিতির মাধ্যমে সকল সদস্যের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য কাজ করতে থাকেন। এভাবে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষগুলোর পাওয়া না পাওয়া, সুখদুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার হয়ে উঠতে থাকেন তিনি।

প্রজেক্টের কাজের পাশাপাশি স্কুল পরিচালনার কাজও সমান তালে চালিয়ে যেতে থাকেন বিউটি। ৩ বছরে ৬ টি স্কুলের প্রজেক্ট সমাপ্ত করেন তিনি। এর মধ্যেই চলতে থাকে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি। ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তিনি। এবারে আর গতবারের মত হতাশ হতে হয়নি তাকে। কিন্তু এর এক বছরের মধ্যেই মৌলবাদীদের তাণ্ডবের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। মৌলবাদীরা ব্র্যাক পরিচালিত সবগুলো স্কুল ভেঙে দেয়। বাধ্য হয়ে বিউটি তখন নতুন কুঁড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা বেতনের শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। এ সময়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে অভিজ্ঞতার কারণে পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকে ডিপোহোল্ডার হিসাবে চাকুরিটাও পেয়ে যান। এখানে বেতনের পাশাপাশি ঔষধ বিক্রি করে কমিশনও পেতে থাকেন।

১৯৯৮ সালে পৌরসভা নির্বাচনে প্রথম বারের মত সংরক্ষিত আসনে নারী প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সেসময় এলাকাবাসীরা তাদের প্রিয় বিউটি আপাকে কমিশনার পদে নির্বাচনের অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বল্প আয়ের বিউটির পক্ষে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। তখন এলাকাবাসীরা তার পক্ষে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু নির্বাচনে অনভিজ্ঞ বিউটি হক মাত্র অল্প কয়েক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। আর এই পরাজয় তার সামনে জয়ের পথটাকেই তুলে ধরে। তাই হতাশ না হয়ে ২০০৪ সালের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সেই নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়েই জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার পথ উমুক্ত হয় তার জন্য। নিজের পরিশ্রম আর সততার কারণে একসময়ের অসহায় এই মেয়েটিই হয়ে যান সমাজের অভিভাবক। সে কারণেই নির্বাচিত হবার পরে লোভ লালসার চোরাস্রোতে নিজেকে ভেসে যেতে দেননি। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সবসময়। সে কারণেই আরো বেশি করে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হবার চেষ্টা ছিল তার। এ আগ্রহ থেকেই তিনি ২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬৭০তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ থেকেই গতানুগতিক উন্নয়ন ধারার অসারতা বুঝতে পারেন। উপলব্ধি করেন উন্নয়ন কার্যক্রমে গণমানুষের অংশগ্রহণ ও মালিকানা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

বিউটি তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছেন, একজন নারীর জন্য জীবন পরিচালনার সংগ্রাম কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। জনপ্রতিনিধি হয়ে প্রথমে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন সেইসব নিপীড়িত ও খেটে খাওয়া নারীদের পাশে। ২০০৬ সালে চট্টগ্রামে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরেই তৃণমূল নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ শুরু করেন। কমিশনার সাবিনা ইয়াসমিনকে সাথে নিয়ে গঠন করেছেন পৌরজেন্ডার কমিটি। শহরের প্রতিটি পাড়ায় একটি দিনে নারীদের নিয়ে কর্মশালা করার মধ্য দিয়ে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। আন্তর্জাতিক নারীদিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসসহ নারী অধিকার আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো উদযাপনে গণমানুষকে সংগঠিত ও সমবেত করছেন। এভাবেই প্রতিদিন সমাজের মানুষ গুলোকে নারী নির্যাতন যৌতুক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ আত্ম নির্ভরতা অর্জনের সংগ্রামে একটু একটু করে জাগিয়ে তুলছেন তিনি। সকলের প্রত্যাশা, নারী পুরুষের সমতার পৃথিবী নির্মাণের মধ্য দিয়েই এ সংগ্রাম পূর্ণতা পাবে।

কিশোরগঞ্জের শিখাঃ এক লড়াকু সংগ্রামী

জয়ন্ত কর

'৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য একটি স্বাধীনভূমির স্বীকৃতি এনে দেয়। কিন্তু কতিপয় সুবিধাবাদীদের দখল-বেদখল খেলার কবলে পরে অনেক দুর্ভাগ্য হয়ে পড়ে ভূমিহীন। যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় পরে তাদের অনেককেই উচ্ছেদ হতে হয় ভিটা থেকে। এমনই এক ভাগ্যহত পরিবারের সন্তান শিখা।

শিখা রানী দেবী। পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের নিশ্চিতপুর গ্রামে। যুদ্ধে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া শিখার দিশাহারা পরিবার শহরের রথখোলা এলাকায় একটি স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ছোট্টঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। তখন খেয়ে-না খেয়ে কোনোরকমে মানবেতর জীবনযাপন করত শিখার পরিবার। শিখার জন্ম ১৯৭৭ সালের ১৫ই নভেম্বর রথখোলার সেই মাটির ঘরে। বাবা হীরালাল ছিলেন একটি সিনেমা হলের সামান্য কর্মচারী আর মা বাসনা রানী দেবী গৃহিণী। দু ভাই দু বোনের মধ্যে শিখা সবার ছোট।

শিশুকাল থেকেই শিখার আচরণ ছিল পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে অনেকটা ব্যতিক্রমী। অভাবের তাড়না, আজ খেলাম তো কাল কী খাব সে দুর্ভাবনায় শিখার বাবা যখন হতাশ হয়ে বলতেন 'আর মনে হয় পারলাম না'। তখন ছোট্ট শিখা ওই বয়সেই বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'বাবা আমি আর একটু বড় হই, দেখবে আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না'।

বাবা যেন অবুঝ এই শিশুটির এতটুকু সান্ত্বনাতেও বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পেতেন। তাই পরের দিন অভুক্ত থেকে আবারো ছুটতেন সিনেমা হলের কাজে। শিখার মা অনেকটা বাস্তববাদী, বিচক্ষণ এবং স্বাধীনচেতা হওয়ায় এত কষ্টের মধ্যেও ভাইদের পড়াশোনাটা বন্ধ হয়নি। তবে যতটুকু খেয়ে শেষ হয় তাতে দু' ভাইয়ের কেউই পরিবারের হাল ধরার মতো অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। টিউশনি করে নিজের জীবনের ন্যূনতম ব্যয়টুকু মেটাতে পারতো শুধু।

এভাবে চলতে থাকে বেশ কটা বছর। শিখা ১৯৯৫ সালে জেলা সরণী বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। শিখার সহপাঠীরা যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য নামি-দামি কলেজে ভর্তির জন্য ব্যস্ত; তখন শিখা গেলেন শহরের গাইটাল এলাকার ব্র্যাক অফিসে। উদ্দেশ্য ছোটখাটো কোনো চাকরি জোটে কি-না। দরিদ্র পরিবারের শিখা ছিলেন পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে বয়স অনুপাতে শারীরিক বৃদ্ধি না ঘটায় দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্র্যাক কর্মকর্তা বললেন, 'এত ছোট মেয়ে, তুমি এসেছো চাকরি করতে!' শিখা বাইসাইকেল চালাতে জানতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেও রাজি আছেন। কিন্তু এতসব যুক্তি দেখানোর পরও তাকে ফিরে আসতে হয় শূন্য হাতে।
অথচ পরিবারের প্রচণ্ড অভাবও আর সহ্য করার মতো নয়। তাই মাটির ব্যাংকের সঞ্চয় আর মায়ের আঁচল থেকে নেওয়া মাত্র ১৫০ টাকা নিয়ে ১৯৯৫ সালে শিখা নিজের বাড়িতেই শুরু করে মশলার ব্যবসা। উদ্দেশ্য পড়াশুনা চালানো আর অভাবের বিরুদ্ধে একটু লড়াই করা। প্রায় ছয় মাস চলে ব্যবসাটি, পুঁজি দাঁড়ায় ১০-১২ হাজার টাকা। মায়ের নামে নাম দেয়া হয় 'বাসনা মসলা'। কিন্তু এক রাতে শিখাদের দুর্বল ঘর প্রবল বৃষ্টির ধারা সামলাতে না পারায় ঘরে থাকা সকল মসলা ভিজে যায়। এর পরের কয়েক দিন ভালোমতো রোদ না ওঠায় ছত্রাক পরে নষ্ট হয়ে যায় সব মসলা। মসলা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর শিখা নিজ বাড়িতে একটি দেশি মুরগির খামার চালু করেন। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় এক বিরল মুরগির মড়ক দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে যায় তার ফার্মের সকল মুরগি।

অদম্য শিখা আবারও শপথ নেন ঘুরে দাঁড়ানোর। তাই নতুন আশা নিয়ে চাকরি নেন হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে। এবার হয়তো দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু এখানেও বিধিবাম দু মাস যেতে না যেতেই বোঝা গেল চাকরির নামে তারা

যা করছে তা আসলে প্রতারণা। পরিবার থেকে এ ধরনের অনৈতিক শিক্ষা না পাওয়ায় প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিখা এখান থেকেও ফিরে আসেন। এবার শিখা অনুভব করতে পারেন তার পিঠটা একেবারেই দেয়ালে ঠেকে আছে; তাই পিছনে যাওয়ার পথ আর কোথায়? তাই তাকে নিতে হয় যাওয়ার শপথ। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি শিখা তার এলাকার নারী ও পুরুষদের সংগঠিত সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করেন এবং পরবর্তীতে উক্ত সঞ্চয়ের টাকা থেকে দরিদ্র নারী-পুরুষদের নামমাত্র লাভে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেন। *জনতা প্রকল্প* নামে এ সংগঠনটি সমাজসেবা থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং ধীরে ধীরে গোটা শহরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে এর কাজ ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবে শিখাদের পরিবারে যখন একটু পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে শুরু করে। ঠিক তখন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান শিখার বাবা। বাবার হঠাৎ মৃত্যু শিখার কাছে মনে হলো বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এবার শুরু হলো তার জীবনের আসল সংগ্রাম। কারণ তার আপন ভাইয়েরাই হয়ে ওঠলো তার প্রত্যক্ষ শত্রু। বাবার মৃত্যুর শোক না ভুলতেই শুরু হলো দুই বৌদিদের মধ্যে সংসারের চাবি দখলের যুদ্ধ। ফলে সংসারে শিখার অবস্থানটি হয়ে ওঠলো খড়কুটোর মতো। এ অবস্থায় শিখা যেহেতু তাদের প্রতিপক্ষ তাই শুরু হলো তাকে যেনতেন একটি পাত্রের কাছে কোনো রকমে তুলে দেওয়ার পাঁয়তারা।

এমন অস্থির সময়ের মধ্যেও শিখা ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। এ ঘটনা শিখাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়। শিখা তাই ওই সময় বিয়ে করতে রাজি হতে পারেননি। কিন্তু বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তার পরিবার থেকেই নানা ধরনের চাপ আসতে থাকে। সে চাপ সামলে এগিয়ে যাওয়া দুরূহ হলেও অসম্ভব হতে পারেনি শিখার জন্য। এই যখন অবস্থা তখন শিখার পরিবার অন্য ফন্দি আঁটে। শিখার ভগ্নিপতি এবং তার কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে প্রচারণা চালাতে শুরু করে যে, এ ধরনের কাজ কোনো ভালো মেয়ে করে না, শিখা নষ্ট হয়ে গেছে। সে পরিবারের মান সম্মান নষ্ট করছে। সুতরাং তাকে অবশ্যই তার *জনতা প্রকল্প* বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু তত দিনে *জনতা প্রকল্পের* পুঁজির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকায় পৌঁছে গেছে। যেখানে ঋণগ্রহীতাদের প্রতি শিখার ছিল অনেক দায়বদ্ধতা। কিন্তু এর মধ্যে পরিবারের একমাত্র আপনজন তার মাও একদিন হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে যান। ফলে শিখা বাস্তবিকই একা হয়ে পড়েন। আর এই সুযোগে তার ভগ্নিপতি শিখার বিরুদ্ধে ৭ লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগ এনে সংস্থাটিকে বন্ধ করার জন্য জেলা সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করেন। কিন্তু শিখা যথাযথ প্রমাণ হাজির করায় এ যাত্রায়ও বেঁচে যান তিনি।

কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন তার হতোদ্যম ভগ্নিপতি নানান কথার সূত্রধরে শিখার সাথে সরাসরি কলহে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে শিখার দুই ভাইও ভগ্নিপতির পক্ষ নিয়ে শিখাকে বেধড়ক মারধর করে। শিখা তখন প্রকৃত অর্থেই বুঝতে পারেন, আপন ভাইয়েরা যেখানে ঘোর শত্রু সেখানে আর কোনোভাবেই থাকা যায় না। ওই দিনই শিখা এক কাপড়ে বাড়ি থেকে অজানার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। রাস্তায় বের হয়ে ভাবতে থাকেন, এখন তিনি কোথায় যাবেন। ভাবনা বেশি দূর অগ্রসর হয় না। কারণ শিখার পরিচিত এমন কেউ নেই যে তাকে এই দুঃসময়ে আশ্রয় দিতে পারেন। ফলে শহরের গৌরাঙ্গবাজার এলাকায় তার যে এক কামরার অফিসটি ছিল সেখানেই উঠে পড়েন। এখানে কোনোরকম একটা মাস পার করেন শিখা। তারপর হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ে বান্ধবী ববির কথা। যাকে তিনিই এক বছর আগে একটা মেস ঠিক করে দিয়েছিলেন।

শিখা আর দেরি না করে ববির কাছে যায় এবং একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই প্রার্থনা করেন। নরসিংদীর মেয়ে ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজের অনার্সের ছাত্রী ববির আন্তরিকতায়ই সেদিন শিখার আশ্রয় মিলেছিল। এরপর থেকে ববি আর শিখা ওই মেসেই এক সাথে থাকতে শুরু করে। কিন্তু ববির থাকা খাওয়া ও পড়ালেখার খরচ তার বাড়ি থেকে আসলেও শিখার তো

সে জায়গাটি শূন্য। তাই জীবন বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করার বিকল্প থাকে না। অবশেষে অনেক ভেবে দুই বান্ধবী মিলে মাত্র ১২ হাজার টাকায় ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজের সামনে একটি ছোট্ট স্টেশনারি দোকান চালু করেন। এক্ষেত্রে মেসের মালিকও তাদের সহযোগিতা করেন।

এরপর শিখার জীবনে সাফল্যে ছোঁয়া লেগেছে। শিখা আর ববির দিন-রাত পরিশ্রমে স্টেশনারী দোকানটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পরিণত হয়েছে। যার বর্তমান পুঁজির পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। *জনতা প্রকল্পে* কাজ করার সময় একটি ভোজ্য পণ্যের বিপণন ও বিতরণের কাজে শিখা মাত্র ৫০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। শিখার সেই পুঁজি বেড়ে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। শিখা ২০০৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আয়োজিত প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম শীর্ষক একদিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর ৬-৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ ময়মনসিংহের প্রশিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ১৮তম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর পরই মূলত নারীনেত্রী হিসাবে কিশোরগঞ্জে শিখার গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব বাড়তে থাকে।

সব মিলিয়ে শিখা আজ কিশোরগঞ্জ জেলার নারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি সম্মানজনক আসন গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর স্বীকৃতিস্বরূপ অতি সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ জেলার নারী ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন *উইমেন চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রির* সদস্য হিসেবে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ঢাকার সোনার গাঁ শেরাটন হলে বেশ কয়েকটি জাতীয় উদ্যোক্তা মেলায় শিখা অত্যন্ত সম্মানের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও তার সাফল্যের কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। সর্বোপরি শিখা আজ একজন সফল ব্যবসায়ী। পাশাপাশি পড়াশুনাতেও আর ক্ষান্ত নেই। ওয়ালি নেওয়াজ খান কলেজের অর্নাস তৃতীয় বর্ষে চলছে তার পড়াশুনা।

যে আপনজন শিখাকে একদিন বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, শিখা আর সেখানে ফিরে যেতে চান না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বর্বর নিষ্ঠুরতা তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন, এখন তার লড়াই সেই অমানবিকতার বিরুদ্ধে। তাই তার আশেপাশে যখন কোনো মেয়ে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে শিখা ঝাঁপিয়ে পড়েন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শিখার বন্ধু মাসুদ, কায়েস, শাহেদ এবং এলাকাবাসী বলেন– আমরা পুরুষ হিসেবে সমাজে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে যা পারিনি, শিখা একজন সাধারণ নারী হয়ে তা করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তাই সবার কাছে শিখা আজ উন্নয়নের এক জীবন্ত মডেল।

জীবন সংগ্রামে জয়ী জাহানারা

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

জন্মের পরই জাহানারা অনেক আদর আর যত্নে বড় হতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্য তার জন্যে কোনোদিনই অনুকূল হয়নি। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে জাহানারা এখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন অনুকরণীয় নারী হিসেবে এগিয়ে চলেছেন। জীবন সংগ্রামে জয়ী জাহানারার পরিচয়টা জানা যাক।

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার ভারড়া ইউনিয়নের মিরকুটিয়া গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দামো. বিশুমিয়া ও জামেনা খাতুন দম্পতির ছয় সন্তানের পঞ্চম জাহানারা খাতুন। তার জন্ম ১৯৬২ সালে। জন্মের প্রথম কয়েক বছর আনন্দেই কাটে। বিশু মিয়া চেয়েছিলেন, তার ছোট মেয়ে বড় হয়ে যেন সমাজে একজন গুণী নারী হতে পারেন। তাই ছোট থেকে বাবা ছিলেন মেয়ের পড়াশুনার দিকে বিশেষ যত্নশীল। ২য় শ্রেণিতে পড়াকালে মারা গেলেন বাবা বিশু মিয়া। জাহানারা বলেন, বাবার মৃত্যুর পরই লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি সন্দিহান হয়ে পড়ি। কিন্তু বড় ভাইদের সাহায্যে পড়াশুনা চালিয়ে যাই। শুরু হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। বড় ভাইমো. মোকসেদ আলী যুদ্ধে যান। ১৯৭৪ সালে ভাইয়ের মৃত্যুর ফলে আবার বাধাগ্রস্ত হয় জাহানারার লেখাপড়া।

জাহানারার ইচ্ছা ছিল, বড় হয়ে তিনি একজন আইনজীবী অথবা ম্যাজিস্ট্রেট হবেন। কিন্তু নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৭৬ সালে বাবনাপাড়ার আব্দুর রহমান খানের সাথে তার বিয়ে হয়। শুরু হয় ২০ সদস্যের পরিবারে ছোট বউ হিসাবে সংসারজীবন। স্বামীর সংসারে এসেও তিনি বসে থাকেননি। পরিবারে সবার বাধার মুখে শ্বশুর ও স্বামীর অনুমতি নিয়ে ভর্তি হন নাগরপুরে স্কুলে। কিন্তু সংসারের কাজকর্ম করে আর পড়াশুনা করা হয় না জাহানারার। তবু পরীক্ষার সময় শিক্ষকদের আগ্রহে ফরম পূরণ করেন এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ১৯৭৯ সালে এসএসসি পাশ করেন। এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি শ্বশুরের অনুপ্রেরণায় অনেক বাধা অতিক্রম করে ১৯৮১ সালে এইচএসসি পাশ করেন।

এবার জাহানারা একটি চাকরি পেতে চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু সংসারে নতুন আরো ঝামেলা তৈরি হয়। ১৯৭৬ সালে বিয়ে হবার ছয় বছরেও জাহানারা মা হতে পারেননি। তার উপর খানবাড়ির বউ চাকুরি করবেন। এবার স্বামীও তার বিপরীতে অবস্থান নেন। জাহানারা হাল ছাড়েননি। তার শেষ আশা তার শ্বশুরমো. আজহার আলী। শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে জাহানারা শুরু করেন বিআরডিবি (Bangladesh Rural Development Board) অর্গানাইজার পদে চাকুরি। এই চাকরি ১৯৯২ সালে শুরু করেন।

জাহানারা ১৯৯৭ সালে বিপুল ভোটে এলাকার সংরক্ষিত মহিলা আসনে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। এরই মধ্যে সমন্বয়কারী সাজেদা বেগমের অনুপ্রেরণায় ২০০০ সালে নাগরপুর উপজেলা পরিষদ মিলানায়নে অনুষ্ঠিত ৭৮তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং সফল্যের সাথে তা শেষ করেন। সে সময়ে সেখানে বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুধীজনরা অংশগ্রহণ করেন।

জাহানারা বেগম প্রশিক্ষণ বিষয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করেন এইভাবে, ‘সেই সময়ের আলোচনায় জ্ঞানের রাজ্য, যোগাযোগ ও নারীর ক্ষমতায়ন আমার খুব ভালো লেগেছিল। এই তিনটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে জাতির করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। যা মানুষের পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই দরকারি।’ সেই থেকে জাহানারার জীবনের লক্ষ্য সমাজের পরিবর্তন এবং দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ায়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তার এলাকায় মেম্বার হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ান। ২০০২ সালের মেয়াদ শেষে ২০০৩ সালের নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হননি। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে

বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে ব্যাপক স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তকে সহায়তা করা কঠিন। তাই আর দ্বিতীয়বার নির্বাচন করেননি। এর মধ্যে ২০০১ সালে তিনি জড়িয়ে পড়েন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে।

২০০৭ সালে জাহানারা আবার নির্বাচিত হন নারীনেত্রী প্রশিক্ষণের জন্য। তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্স'-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পরে তিনি নিয়মিত ফলোআপে অংশগ্রহণ করেন। এখনো তার পারিবারিক কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তবু জাহানারা এগিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে কথা উঠতেই তিনি বলেন 'আগে আমি নানা বয়সের নারীদের সাথে সব কথা বলতে পারতাম না। সংকোচ বোধ হতো, এরা মেয়ে ও নাতনীর বয়সী; তাদের সাথে সব কথা বলা যায় না। প্রশিক্ষণটি আমার এই ভুলটি ভেঙে দিয়েছেন, আমি প্রতিটি বিষয়ে গভীরভাবে জানতে পারছি এবং সবার সাথে শেয়ার করে তাদের সহযোগিতা করতে পারছি।'

জাহানারা জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তার বর্তমান অবস্থান নাগরপুর ইউনিয়নের বাবনাপাড়া গ্রামে অবস্থান করে কাজ করছেন। তার কাজগুলোর মধ্যে কর্মশালা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জন্মনিবন্ধন, নারীনির্যাতন, স্যানিটেশন নিয়ে উঠান-বৈঠক করে যাচ্ছেন। এছাড়া জাতীয় কন্যাশিশু, আন্তর্জাতিক নারীদিবসসহ সকল জাতীয় দিবসগুলো পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তার কাজের সহযোগিতার জন্য নতুন নতুন উজ্জীবক এবং নারীনেত্রী তৈরিসহ সহযোগিতা করছেন। ইতিমধ্যে তিনি পঞ্চম ব্যাচে স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি গড়ে তুলেছেন *'আশার প্রদীপ'* নামে একটি নারী সংগঠন। এছাড়াও জাহানারা পরিবেশ রক্ষার্থে গ্রামের মহিলাদের সাথে কাজ করছেন। তিনি নিজের বাড়িতে ব্যাপক সংখ্যায় ফল ও কাঠগাছ লাগিয়েছেন। তিনি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করছেন এবং কখনো কখনো নিজে চারা দিয়ে তাদের গাছ লাগানোর প্রেরণা দিচ্ছেন।

বর্তমানে জাহানারা উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মনে করেন, স্থানীয় সরকারই পারে মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে। বর্তমানে তিনি ইউপি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জাহানারা খাতুনের মতো যদি সবাই সংগ্রামী হতেন, তবে আমাদের দেশের সমাজ অনেক আগেই বদলে যেত। তাই সবার প্রতি অনুরোধ, আসুন দেশ গঠনে আবারও দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি। আমরা একদিন সফল হবই।

জেসমিনের স্বপ্নঃ স্বনির্ভর বাংলাদেশ

মাহামুদুল হাসান তুহিন

'অভাবে স্বভাব নষ্ট'– কথাটা সত্যি নয়, তাই প্রমাণ করলেন পাবনা জেলার শ্যামপুর টাটী গ্রামের মেয়ে জেসমিন। পুরো নাম মোছাম্মত জেসমিন বেগম। এই অভাব বা দারিদ্র্যকে জয় করে তিনি এখন একজন স্বাবলম্বী মানুষ। জেসমিন বেগম ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে এক গরিব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ৬ বোন ও ৩ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ২য়। পরিবারে সচ্ছলতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। কারণ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় জমি ছিল অপ্রতুল। তার উপর জমিগুলো দিনের পর দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছিল নদীগর্ভে। এতে দারিদ্র্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে জেসমিনের পরিবারকে। সমস্যা প্রতিদিনই বাড়তে থাকে। তাই এ অবস্থায় জেসমিনের লেখাপড়ার জন্যে তার মামা তাকে রাজবাড়ির বেড়াডাঙায় নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে জেসমিন পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন।

পড়াশুনায় জেসমিন খুব ভালো ছিলেন। ক্লাসে সব সময় প্রথম হতেন। শিক্ষকরা জেসমিনকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ঠিক তখনই তার বাবা বিয়ের আয়োজন করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্কুল শিক্ষক মনির হোসেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্বামীর উপার্জনে কোনো রকমে জীবন চলছিল। কিন্তু সেই সুখও তাদের বেশি দিন টিকল না। কারণ তাদের সন্তানের সংখ্যা যখন দু ছেলে এবং এক মেয়ে ঠিক তখনই জেসমিনের স্বামী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। স্বামীর আয় প্রায় বন্ধের দিকে। তাদের নিজস্ব জমি যা ছিল তা দিয়ে সংসার কোনো রকম চলতে থাকে। তবে তাদের একটি নৌকা ছিল। সেটি ভাড়া দিয়েও কিছু আয় হতো। কিন্তু তাদের আয়ের অধিকাংশ টাকা স্বামীর অসুখের পেছনে খরচ হয়। এভাবে চলতে গিয়েও নিয়তি মেনে নিলো না। তাদের যে আবাদি জমি ছিল তা এ পর্যায়ে যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

এমন অবস্থায় জেসমিন অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে আসেন। কিছুদিন পূর্বে তার বাবা মারা যাওয়ায় জেসমিন ভাইয়ের সংসারে ওঠে। সেখান থেকে কিছুটা সামলে উঠতেই জীবনে নেমে আসে এক আকস্মিক বিপর্যয়। তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। সন্তানদের নিয়ে জেসমিন খুবই অসহায় বোধ করেন। ভাইয়ের সংসারে থেকে নৌকাভাড়া হিসেবে যে সামান্য টাকা পেতেন, তা দিয়ে সংসার কোনো মতে চলতে থাকে। ভাই তাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কিন্তু জেসমিনের ভাইটিও কিছুদিন পর মারা যায়।

অভিভাবকহীন জেসমিনের পথ চলা শুরু হয়। এক রকম অনিচ্ছায় তিনি পাবনায় এসে ১৯৯৯ সালে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ নেন। সেখান থেকে ফিরে বাড়িতে স্বল্প পরিসরে কাজ শুরু করেন। বাড়ির আশেপাশেই তিনি কাজ করতেন। মনে মনে ভাবেন, এ কাজ কে আরো বাড়ানো যায় কিনা। ঠিক তখনই একটি ঘটনা ঘটে। কারণ তিনি ৭৪৬তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জ্ঞানের রাজ্য, আদর্শ গ্রাম এবং নারীর ক্ষমতায়নের অংশটি জেসমিনকে খুবই আকৃষ্ট করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পরই জেসমিন যেন বদলে যান। নিজের মধ্যে এক নতুন শক্তি আর আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে থাকেন তিনি। জেসমিন মনস্থির করেন, এমন একটা কিছু করবো যা শুধু নিজের উন্নয়নই ঘটাবে, না পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যেই জেসমিন একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন, যার মধ্যে দিয়ে নারীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও আত্মনির্ভরশীল করা তোলা সম্ভব হবে। বিষয়টি নিয়ে তিনি এলাকার উজ্জীবকদের সাথে আলোচনা করেন। তারা সবাই সমিতি করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্যামলী মহিলা সমিতি'।

সমিতির সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সাধারণ কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। তবে সমিতির কোনো সদস্যেরই কোনো বিশেষ পদমর্যাদা নেই। এখানে সবার মতামতের ভিত্তিতে সমিতির সকল কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত

নেয়া হয়। এই সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এখানে অধিকাংশ সদস্যই উজ্জীবক। তবে এখনও সমিতির নিজস্ব কোনো অফিস তৈরি হয়নি। আর তাই সমিতির সভা, বৈঠক বা যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় জেসমিনের বাড়িতে বসে। সাধারণত এই সভা বা বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয় প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে। এতে সমিতির সকল সদস্য উপস্থিত থাকেন। জেসমিন সমিতিতে মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করেন। এতে করে তাদের সঞ্চয় বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে সমিতি।

জেসমিন এই সমিতির মাধ্যমে শুধুমাত্র দরিদ্র বিত্তহীন মহিলাদের নয়, এলাকার সকল দরিদ্র ও ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের উন্নয়ন করে চলেছেন। আর সেজন্যই এ সমিতি থেকে এলাকার প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষই তাদের নানা প্রয়োজনে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এই সমিতির প্রধান কাজ হল, এলাকার দরিদ্র মানুষদের টাকা সঞ্চয় এবং তাদের ঋণ প্রদান করা। সদস্যরা প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে সমিতির তহবিলে জমা দেন। তারা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয়, মুদির দোকান, ব্লক-বাটিকের কাজ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হন। সমিতি থেকে এ পর্যন্ত যারা ঋণ নিয়েছেন তার আজ সবাই স্বাবলম্বী।

জেসমিন মনে করেন, আজও বাংলাদেশের নারীরা সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার, তাই তিনি এলাকার দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের নিয়ে দু মাসে একটি সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি ৩০ জন করে মোট দুটি প্রশিক্ষণে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেন। কারণ তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র ঋণের মাধ্যমে একজন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে না। এর পাশাপাশি সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি যদি হাতে কলমে আরো দক্ষ হয়, তবেই প্রকৃত অর্থে তার ভাগ্যের উন্নয়ন ও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। পাশাপাশি জেসমিন মেয়েদের শিক্ষিত এবং লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য নানা ধরনের প্রচারণা চালান। এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচিসহ নানা ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে নিজে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এলাকার অন্যদেরও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছেন।

জেসমিন নিজে দর্জির কাজের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে মাসে ৫০০০ টাকার বেশি রোজগার করেন। তিনি এখন শুধু স্বাবলম্বীই নন, তিনি সুখী। তাকে এখন সংসার চালাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। তার এ পর্যন্ত আসার জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তাকে নতুন জীবন শুরু করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। জেসমিন এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখেন, তার প্রিয় বাংলাদেশ একদিন দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

দৃঢ় প্রত্যয়ী নাসিমা

আবু জিসান এম. আলমগীর

নিরলস প্রচেষ্টা আর বিরামহীন পরিশ্রম নাসিমা ইয়াসমীনকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবেন না, নিজের এলাকার মানুষগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এলাকার মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তার প্রচেষ্টা আমাদের অনেকের জন্যই প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে।

মুন্সীগঞ্জ সদরের রামপাল ইউনিয়নের সিপাহীপাড়ায় ১৯৬৮ সালে নাসিমা ইয়াসমীন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম আবু ছাইদ চৌধুরী ও মাতা মরহুমা আকলিমা বেগমের পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে নাসিমা ইয়াসমীন পঞ্চম। ১৯৮৪ সালে রামপাল এনবিএম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি এস এস সি পাশ করেন। রামপাল মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পাশ করেন। শ্রীনগর সরকারি কলেজ থেকে নাসিমা ইয়াসমীন ১৯৮৮ সালে বি এ পাশ করেন। সে সময়ে সিপাহীপাড়া গ্রামে তিনিই প্রথম বিএ পাস একমাত্র নারী ছিলেন।

শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ২০০৬ সালে নাসিমা ইয়াসমীন ৯৫০তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৩তম স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে নাসিমা ইয়াসমীনের নেতৃত্বে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম মুন্সীগঞ্জ জেলা কমিটি গঠন করা হয়। তিনি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মীরকাদিম পৌরসভা, রামপাল ইউনিয়ন, মহাকালী ইউনিয়ন, মুন্সীগঞ্জ সদরসহ সমগ্র এলাকায় তার নেতৃত্বে কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্যরা বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং শিশুদের অধিকার রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। ২০০৮ সালে নাসিমা ইয়াসমীনের নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ জেলা সদর, রামপাল, মিরকাদিম, রিকাবী বাজার, পঞ্চসার, মুক্তারপুরসহ প্রায় ৭টি স্থানে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপিত হয় এবং উল্লিখিত স্থানগুলোতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসও পালিত হয়।

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রিকাবী বাজারের বিশিষ্ট সমাজকর্মী, সংগঠক মাসুদ ফকরী খোকনের সাথে ২৪ বছর বয়সে নাসিমা ইয়াসমীনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ১৯৯১ সালে তিনি জাতীয় যুব উন্নয়ন থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি রিকাবী বাজার ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পাঁচশত মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৯২ সালে নাসিমা ইয়াসমীন রিকাবি বাজার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে তিনি মিরকাদিম পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি রিকাবি বাজার এলাকার অসহায়, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের সেলাই, শাকসবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

মুন্সীগঞ্জ সদরের নগর কসবা, এনায়েত নগর, টেঙ্গর, কালিন্দিপাড়া, রিকাবি বাজার পূর্ব পাড়া, রিকাবী বাজার পশ্চিম পাড়া, নৈদিঘীরপাড়, রামগোপালপুর এবং নূরপুরসহ আরো অনেক গ্রামে যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ১৯৯১ সাল থেকে নাসিমা ইয়াসমীন কর্মশালা ও উঠান-বৈঠক শুরু করেন। এলাকার আশা ও ব্র্যাক অফিসের কার্যালয়কে তিনি ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করেন। সপ্তাহের প্রতি রবি ও সোমবার তিনি এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ১৯৯৫ সালে নাসিমা ইয়াসমীন রিকাবি বাজার ১নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি রিকাবি বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষানুরাগী সদস্য নির্বাচিত হন।

যৌতুক, বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশু পার্ক স্থাপন এবং ইদ্রাকপুর কেল্লাকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করার জন্য ২০০৮ সনের ৮ ও ২৪ মার্চ নাসিমা ইয়াসমীনের নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ শহরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া

পরিবেশ রক্ষার জন্য একই বছরের ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ জেলা সদরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫ শতাধিক নারী পুরুষ এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি এলাকার গরিব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই সরবরাহ, বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণসহ পোষাক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এলাকার বিত্তশালী ব্যক্তিরা তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন।

১৯৯০ সালের ১৮ নভেম্বর নাসিমা ইয়াসমীনের নেতৃত্বে *পদক্ষেপ সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন* নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। *পদক্ষেপ সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের* উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে ৫টি পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এইডস প্রতিরোধকল্পে সচেতনতামূলক কর্মশালা ও তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইন করা হয়ে থাকে। সংগঠনটির উদ্যোগে প্রতি বছর প্রায় ২ শত গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পোশাক এবং বইপত্র দেয়া হয়ে থাকে। *পদক্ষেপ সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন* নির্যাতিতা নারীদের আইনগত সহায়তা, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বেদে, জেলে, বাদ্যকর, কলু, মুচিদের মধ্যে গণসচেনতা সৃষ্টি, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে প্রতি মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখে *পদক্ষেপ সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের* উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সাথে মিটিং হয়ে থাকে। মিটিং শেষ হওয়ার পর তারা মোবাইল টিম নিয়ে জেলার গুরুত্বপুর্ণ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, লঞ্চঘাট ইত্যাদি স্থানে ধূমপানরত অবস্থায় কাউকে পাওয়া গেলে তাদের কাছ থেকে ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এর ফলে এ সব উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান করতে সাধারণ লোকজন সাহস পায় না।

মুন্সীগঞ্জ সদরের মাকুহাটি ইউনিয়নের মাকুহাটি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে মাহমুদা বেগমের সাথে রিকাবী বাজারের তারামিয়ার ছেলে কাউছার আহম্মেদের যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন নাসিমা ইয়াসমীন। ১৭ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে এ বিয়ের আয়োজন করে তিনি এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এ দম্পত্তি বর্তমানে সুখেই আছেন।

২০০৭ সালে নাসিমা *'নারী কল্যাণ সমিতি'* নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। অসহায়, নির্যাতিতা নারীদের আইনী সহায়তা প্রদান করা, বিদেশগমনকারী নারীদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য এ সংগঠনটি পরিচিতি লাভ করে। রিকাবীবাজার পূর্বপাড়ার মাহবুব আলমের মেয়ে তানিয়ার স্বামী তাকে বউ হিসেবে অস্বীকার করলে আইনি সহায়তার মাধ্যমে নাসিমা তার সমাধান করার জন্য কাজ করেছেন।

মুন্সীগঞ্জ সদরের রিকাবি বাজারের নগর কসবা গ্রামের সিরাজ মিয়ার কন্যা রোকসানার বিয়ে হয় নারায়ণগঞ্জের আলীর টেক ইউনিয়নের বিপ্লবের সাথে। বিয়ের পর পরই ছেলে মেয়েকে যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। যৌতুক দিতে না পারায় মেয়েকে তিন বছর বাবার বাড়ি রেখে দেয়া হয়েছে। মীরকাদিম পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের সহায়তায় নাসিমা গ্রাম সালিশের মাধ্যমে তা মীমাংসা করে দেন। যার ফলে রোকসানা তার স্বামীকে নিয়ে সুখেই সংসার করছেন।

আমাদের সমাজের কুসংস্কার দূর করে সমাজে নারীদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার জন্য অন্যান্য নারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। নাসিমা ইয়াসমীনের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় মুন্সীগঞ্জ থেকে আরো ২১ জন নারী 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। অচিরেই তারা মুন্সীগঞ্জে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন বলে নাসিমা আশাবাদী। নতুন নারী নেত্রীদের সাথে নিয়ে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মুন্সীগঞ্জ সদরের পঞ্চসার ইউনিয়নে একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণও করেছেন। ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ৭০ জন অংশগ্রহণকারীই নারী ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ সদরের প্রতিটি ইউনিয়নে নাসিমা উজ্জীবক প্রশিক্ষণ করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন। এভাবেই তিনি মুন্সীগঞ্জের গ্রামে গ্রামে নারীমুক্তির বাণী পৌঁছে দিতে চান।

রামুর নারী উন্নয়নের প্রতীক

আবু মোস্তাফিজ

রামুর মেয়ে দিলরুবা। কখনো কখনো ঝর্নার মত চঞ্চল হলেও দিলরুবা ভাবেন বেশির ভাগ সময়ই রামুর নয়নাভিরাম ছোট ছোট টিলার মতোই ভাবগম্ভীর। শৈশব থেকেই কী যেন ভাবেন মেয়েটা। সমাজ, সংসার, পৃথিবী, মানুষ তার সব সময়ের ভাবনা। আর তখন থেকেই অন্যের দুঃখে দুঃখী আর অন্যের সুখে সুখী হওয়াটা দিলরুবার স্বভাবজাত। যে কারণে যে বয়সে সমাজের আর দশটা মেয়ে ঘর সংসারের স্বপ্ন বোনে, সে সময় দিলরুবার ভাবনা নারীর মুক্তি, তার ক্ষমতায়ন, তার আত্মনির্ভরশীলতা, মা ও শিশুর সুস্থ জীবন। সর্বোপরি মানুষের উন্নত জীবন। তবে দিলরুবার ভাবনা কোনো স্বপ্নবিলাসীর মতো শুধু ভাবনাতেই আটকে থাকেনি। ভাবনার সাথে যোগ হয়েছে কর্মেরও।

অবশ্য তার আগে দিলরুবাকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেকটা পথ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তাকে নিতে হয়েছে সমাজকর্মের হাতেখড়ি। স্থানীয় নাদেরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর দিলরুবা ভর্তি হন রামু ডিগ্রি কলেজে। ২০০৭ সালে যথারীতি তিনি এইচএসসি পাশ করেন। এরই মধ্যে তার সাথে পরিচয় ঘটে কক্সবাজার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক রফিকুল ইসলামের। যার আমন্ত্রণেই দিলরুবা ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ১২২১তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দিলরুবার জন্য যা ছিল সত্যিই অভিনব। এ যেন অন্য এক জগৎ। যেখানে সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায়। দিলরুবা নিজেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই প্রশিক্ষণেই তিনি পরিষ্কার ধারণা পান নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধ, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসহ নানা বিষয়ে।

এরপরই মূলত দিলরুবার সেই ভাবনাগুলো বাস্তবতার দেখা পায়। তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেন সমাজকর্মের। দিলরুবার এমন ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তার পরিবার। বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই এগিয়ে এসেছে। কারণ দিলরুবার বাবা মোজাম্মেল হক নিজেও একজন সমাজকর্মী। যে কারণে দিলরুবার কোনো কষ্ট হয়নি নিজের বাড়িটাকে কর্মস্থল হিসাবে ব্যবহারের। রামু পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সহযোগিতা নিয়ে দিলরুবা শুরু করে দেন তার সমাজসেবা। প্রথমেই গ্রামের গর্ভবতী মা এবং শিশুদের প্রতি নজর দেন তিনি। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানেন গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে সুস্থ শিশুর জন্মদান সম্ভব নয়। আর সুস্থ শিশুর জন্ম সম্ভব না হলে এবং শিশু মৃত্যুরোধ করা না গেলে দেশের উন্নয়নও অসম্ভব। তাই সঠিক সময়ে প্রতিটি শিশুকে টিকা দিতে তিনি গ্রামের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশু এবং শিশুর মায়েদের ও ডেকে ডেকে টিকা কেন্দ্রে পাঠান। গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন জটিলতা এড়াতে পরামর্শ দেন তিনি। এজন্য প্রতিমাসে অন্তত একবার নিজ বাড়িতে এসব মায়েদের নিয়ে বৈঠকের আযোজন করেন তিনি।

একই সাথে তিনি নজর দেন গ্রামের কিশোর কিশোরীদের প্রতি। কারণ দিলরুবা তার নিজের জীবন দিয়েই বুঝতে পেরেছেন, অল্প বয়সী এসব কিশোর-কিশোরীদের মনের ব্যথা। এরা না পরিণত মানুষ না অপরিণত। ফলে ঝামেলাটা বাঁধে ওখানেই। কেউ তাদের শিশু মনে করে, আবার কেউ ভাবে বয়স্ক মানুষ। এসব দেখে প্রতিটি কিশোর-কিশোরীরই মুষড়ে পড়া স্বাভাবিক। কারণ কেউ তাদের সাথে সঠিক আচরণটি প্রায় সময়ই করে না। উপরন্তু তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলোও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিজেদের কাছেই। বিশেষ করে কিশোরীদের। যে ব্যাপারগুলো দিলরুবার খুব ভালোভাবেই জানা। তাই বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক নানা পরিবর্তন বিষয়ে এসব কিশোরীদের সচেতন করে তোলার পাশাপাশি তাদের ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেন তিনি। ফলে দিলরুবার গ্রাম পানিরছড়া তো বটেই আশপাশের গ্রামের মা, শিশু ও কিশোরীরা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

দিলরুবা খুব ভালো করেই জানেন, একটি নির্ভর গ্রামের প্রধান শর্তই তার আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা। যেজন্য তিনি গ্রামের স্যানিটেশন ব্যবস্থাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের ১২৫ টি পরিবারের মধ্যে বর্তমানে অন্তত ৩০টি পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে। সংখ্যাটি প্রতিদিনই বেড়েই চলছে। তবে দিলরুবার বিশ্বাস, চলতি বছরের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবেন।

এছাড়া যৌতুক আর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও দিলরুবার প্রচারণা থেমে নেই। এরই মধ্যে তিনি গ্রামে এ বিষয়ে চারটি সভা সফলভাবে শেষ করেছেন। যেখানে গ্রামের নারী ও কিশোরীদের তিনি এর কুফল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। এবং এসব রোধের কর্মপদ্ধতিও আলোচনা করেছেন। এছাড়া যুববান্ধব কর্নার ক্লাবের মাধ্যমে তিনি গ্রামের কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করে তুলছেন। এজন্য তিনি মাসে অন্তত ২টি করে ক্লাস নিচ্ছেন। যেখানে তিনি ১২ জন ছেলে এবং ১২ জন মেয়েকে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিচ্ছেন।

পুরো রামুকে আরও সুন্দর আরও সবুজ করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। দিলরুবা সেখানেও পিছিয়ে নেই। এরই মধ্যে তিনি ৩০০টি চারাগাছ লাগিয়েছেন। এত কিছুর পরও দিলরুবার স্বপ্ন কিন্তু একজন ভালো প্যারামেডিক হওয়া। আর একজন ভালো প্যারামেডিক হওয়ার মাধ্যমেই দিলরুবা পেতে চান গর্ভবতী মা ও শিশুর পরম বন্ধুতা। আর এভাবেই রামুর মতো একটি প্রত্যন্ত এলাকায় দিলরুবা এগিয়ে চলেছেন সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে। তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছা থাকলে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব। দিলরুবা উপলব্ধি করেছেন, কিশোর-কিশোরী ও নারীদের উন্নয়নই একদিন ব্যাপক সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করবে।

লুৎফা: এক অনুপ্রেরণার নাম

আল মারুফ

মেয়েটির নাম লুৎফুন নাহার। সবাই ডাকতো লুৎফা। ১৯৬২ সালের ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এক দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। বাবামো. আব্দুল বারী আর মা রেজিয়া বেগমের আট সন্তানের মধ্যে লুৎফা সবার বড়। ছোটবেলা থেকেই দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন নিজের মধ্যে গোপনে লালন করতে থাকেন।

লুৎফা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সহপাঠী এবং মুক্তাগাছার মেয়েদের সাথে নিজ উদ্যোগে গান ও নাচ শিখেন। বিদ্যালয় ও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নৃত্য পরিবেশন করে ব্যাপক প্রশংসিত হন তিনি। আর অন্যদিকে খেলাধুলায়ও সুনাম অর্জন করতে থাকেন সমান ভাবে। শটপুট, হাইজাম্প ও বর্শা নিক্ষেপে তিনি প্রথম একজন মেয়ে হিসেবে এ অঞ্চল থেকে জাতীয় পর্যয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেও আসল জায়গায় হেরে যান লুৎফা। পিতাসহ অন্যান্য অভিভাবকগণ বুঝতে পারেন লুৎফা বড় হয়ে গেছে। আর গান বাজনা, খেলাধুলা নয়। লুৎফার বিয়ের কথা ভেবেই সবকিছু বন্ধ করে দিতে হবে। যেই কথা সেই কাজ– এক কথায় বন্ধ হয়ে গেল সব। পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বাকিগুলো জীবনে আর করবেন না বলে একরকম নাকে খত দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল।

সময়ের ধারাবাহিকতায় লুৎফা ১৯৭৮ সালে মুক্তাগাছা এনএন বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। এরপর সবার হাতেপায়ে ধরে জোটে কলেজে ভর্তি হওয়ার অনুমতি। লুৎফার কলেজ জীবনের তিনমাস অতিক্রম না হতেই একদিন তার নানা কলেজে ক্লাস চলাকালীন দরকারি কাজ আছে বলে বাড়তে ডেকে নিয়ে আনেন। বাড়িতে এসে লুৎফা দেখতে পান তার বিয়ের আয়োজন চলছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে যায়।

দরিদ্র পিতার বাড়িতে শত অভাবের বিড়ম্বনা, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা থেকে শুরু করে হাজারো কষ্টও অনেক মেয়ে হাসিমুখে মেনে নেয়। তারা ভাবে যে বিয়ে হলে স্বামীর বাড়িতে হয়তো সুখে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। লুৎফাও সে আশায় বুক বেধেছিলেন অন্যদের মত, কিন্তু বিয়ে তার জন্য কোনো নতুন প্রত্যাশার বার্তা তো নিয়ে আসেনি। বরং তা লুৎফাকে করে চরমভাবে আশাহত! বিয়ের তিনদিনের মাথায় লুৎফা জানতে পারেন তার স্বামী আগে আরো দুটি বিয়ে করেছেন এবং তার একাধিক সন্তানও রয়েছে। সেসময় লুৎফা তার স্বামীসহ বাবার বাড়িতেই ছিলেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চূড়ান্ত পরিণতির কথা উপলব্ধি করে লুৎফাকে এ বিয়ে মেনে নিতে হয়। নারীত্ব আত্মমর্যাদাবোধ আর মান সম্মানের কাছে হতে হয় চরমভাবে পরাজিত। তবে তার আর স্বামীর বাড়ি যাওয়া হয়নি। এ ধরনের একটা কাণ্ড ঘটানোর খবর স্বামীর আগের স্ত্রী ও সন্তানেরা টের পেয়ে যায় এবং তারা খুবই ক্ষুব্ধ হন। ফলে স্বামীও লুৎফার সাথে তার বাবার বাড়িতে থেকে যায়। এ দিকে পারিবারিক কলহে তার বাবার যা সম্পত্তি ছিল, তার অধিকাংশ প্রায় হারিয়ে ফেলে। শুরু হয় দুর্ভাগ্যের আরেক পর্ব। মাথাগোঁজার মতো ঠাঁইও থাকে না লুৎফার । অন্যের আশ্রয়ে থাকা, নিজের কোনো আয় নাই, স্বামীরও নাই কোনো বৃত্তি। এরকম দুঃসহ অবস্থায় তাকে মা হতে হয় চার চারটি সন্তানের। অভাব, তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় জীবনমরণ সংগ্রামে নিপতিত হয় লুৎফা আর তার সন্তানদের জীবন। তার ভাষায় ‘কতদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে, ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে, এরকম এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়জন আছে কিনা তার হিসাব নেই।’

অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই একজন স্বেচ্ছসেবী হিসেবে লুৎফা জাতীয় মহিলা সংস্থার ইউনিট সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করতেন। সে সময় তার কিছু বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও চালু ছিল। লুৎফা তার অর্থাভাব দূর করার জন্য তার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কাজী ফিরোজা ইসলামের সহযোগিতায় একটি স্কুল চালুর উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালে তাদের যৌথ উদ্যোগে মুক্তাগাছা

আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লুৎফা স্কুলে মাত্র তিনশ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষকতার চাকরি নেন। নানা দুঃখ-কষ্ট আর খেয়ে না খেয়ে যখন লুৎফার জীবন চলছিল, তখন তার জীবনে নেমে আসে আরেক ভয়াবহ বিপদ। লুৎফার স্বামী হঠাৎ করে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এ যেন নিয়তির নিষ্ঠুর পরীক্ষা। চার চারটি ছেলেমেয়ে আর পাগল স্বামীকে নিয়ে লুৎফা হয়ে যান একেবারে অসহায়। তখন কী করবেন কোথায় যাবেন এসব ভেবে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে যান তিনি। চরম অস্বস্তির মধ্যে থেকে মাথাও ঠিক কাজ করে না। এছাড়া একাধিক বিয়ে করা স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে সামাজিক গঞ্জনা তো আছেই।

লুৎফার সামান্য আয়ে (মাসিক তিন শত টাকা) তখন বেঁচে আছেন তার চারটি সন্তান আর মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামী। নিয়তির নির্মম পরিহাসকে মেনে নিয়েই চলতে থাকে লুৎফার জীবন। তবু লুৎফা পরাজিত হতে চাননি। জয়ী তাকে হতেই হবে। প্রতিদিন রাতে ভাবেন, হয়তো আগামীকাল সকালটা নতুন কোন সুসংবাদ নিয়ে আসবে; হয়তো বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন খুঁজে পাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেত- হঠাৎ একদিন স্কুলে গিয়ে জানতে পারেন স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী ফিরোজা ইসলাম কাউকে কিছু না বলে বিদেশে চলে গেছেন। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরে। নিজের লেখাপড়ার দৌড় তো অল্প, এ স্কুল এখন কে চালাবেন আর স্কুল না চললে তার তিনশত টাকা বেতনের কী হবে! তিনি কী করে বাঁচবে!

পিঠ যখন দেয়ালে গিয়ে ঠেকে তখন তো আর পিছানোর সুযোগ নেই। তাই আত্মবিশ্বাসী লুৎফা গোটা স্কুলটা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। কিন্তু সেখানেও অনেক বাঁধা। একদিন জানা গেল স্কুলটা অর্পিত সম্পত্তির মধ্যে গড়ে উঠেছে। এলাকার প্রভাবশালীরা তাকে এবং এ স্কুলটাকে গায়ের জোরে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তার বিরূদ্ধে থানায় মামলা ঠুকে দেয়া হল। চলতে থাকল ব্যাপক হয়রানি। কিন্তু তার পরও চলতে থাকল লুৎফার জীবনসংগ্রাম। লুৎফা স্কুলের মেয়েদেরকে এমনভাবে সংগঠিত করলেন যে, যেদিন দুস্কৃতকারীরা স্কুলটাকে জবরদখল করতে আসল স্কুলের সকল মেয়েরা দা, বটি, লাঠিসোঠা নিয়ে তাদের প্রতিহত করে স্কুলের দখল টিকিয়ে রাখে। লুৎফার দৃঢ় মনোবল ও বিচক্ষণতার জন্য এ প্রতিষ্ঠান নির্ঘাত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তবু লুৎফার জীবনের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শেষ হয় না। বিদ্যালয়টি কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর তার জীবনে যখন কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে, তিনি তার এবং সন্তানদের মাথা গোঁজার মত স্থানীয় এক পীরের কাছ থেকে নগদ দামে দুই শতাংশ জমি ক্রয় করেন। সেখানে ঘর বানান এবং সন্তানসহ বসবাস করেন। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল ঐ পীরের লোকজন একই জমি আগেই অন্য কারো কাছে বিক্রি করে রেখেছিলেন। ফলে এ অবস্থায় নিজের অতিকষ্টে অর্জিত অর্থ দিয়ে কেনা দুই শতাংশ জায়গা থেকেও তাকে উৎখাত হয়ে অন্যের আশ্রয়ে চলে যেতে হয়। যাই হোক সংগ্রামী মানসিকতা আর লড়াকু মেজাজ যার জীবনের সাথে মিশে রয়েছে, তাকে তো বিজয়ী হতেই হবে। কোনো বাধাই তার গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারবে না। ঠিক তেমনি অবশেষে লুৎফাও হারেনি তার জীবন সংগ্রামে। ১৯৮০ সালে শত অভাবের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি এখন মুক্তাগাছার মধ্যে একটি মডেল শিক্ষাপীঠ হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত এবং এর ছাত্রী সংখ্যা এখন প্রায় হাজার। শিক্ষক সংখ্যা এখন বাইশ। লুৎফুন নাহার এখন তার বিদ্যালয়ের সর্বজনের কাছে সম্মানিত একজন শিক্ষয়িত্রী। হাজারো মেয়েদের কাছে তিনি জীবন সংগ্রামের প্রেরণা।

স্কুলের সাফল্যে যখন তার জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে তখন লুৎফা শুরু করেছেন আরেক নতুন সংগ্রাম। সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র নারীদের জন্য কিছু করার প্রত্যয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন মুক্তাগাছা বহুমুখী সমাজ কল্যাণ মহিলা সংস্থা নামে একটি আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে দিয়ে মেয়েদের নিয়ে বাঁশ-বেত, উল, কুশি-কাটা, কুটির শিল্প, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে এলাকার অসংখ্য নারীকে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু আর্থিক সাফল্য নয় এ সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিপদগ্রস্থ নারীদের আইনি ও সালিশী সহায়তা, বাল্য বিবাহ বন্ধ, যৌতুক মুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা, অবৈধ তালাকের

বিরুদ্ধে আইনী উদ্যোগ প্রভৃতি নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের কাজ পরিচালনার একপর্যায়ে সাংগঠনিক ভাবে লুৎফা হাঙ্গার প্রজেক্টের ৮৪৪ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। তার ভাষায় হাঙ্গার প্রজেক্টের সাথে তার এ সংযুক্তি তার আন্দোলনে এক অভাবনীয় গতি সঞ্চার করেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চলবে। এ ভাবনা তিনি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাছ থেকে পেয়েছেন। ফলে তিনি হতে পেরেছেন জীবন সংগ্রামে একজন সাহসী সৈনিক।

লুৎফুন নাহার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেরও এক সাহসী সৈনিক। একাত্তরে মাত্র নয় রছর বয়সী লুৎফা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের বাড়ির পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র মানুষগুলো দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য নিবেদিত। সুতরাং তাদের কাছে লুকিয়ে খাবার ও পানি পৌঁছে দেয়া ছিল তার নৈতিক দায়িত্ব। এ কাজটি একাত্তরে তিনি অত্যন্ত নিবেদিত ভাবেই করেছিলেন। স্বাধীন এ দেশ তাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিলেও এতে তার কোনো দুঃখ নাই। কারণ তার ভাষায় দেশে অনেক ভালো মানুষ আছে। ভালো মানুষ গুলো তার মতই অসহায় । তাদের সবার এক হয়ে সত্যের জন্য লড়াই করা উচিত।

বর্তমানে ৪৭ বছরের লুৎফুন নাহার মনে করেন তার কৈশোরের স্বপ্ন একেবারে বৃথা যায়নি। তিনি নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ বলেই মনে করেন। ব্যক্তিজীবনে শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও তিনি তার প্রতিটি সন্তানকে শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। সমাজের সবাই আজ তার কথা শোনে। যে কোনো অনুষ্ঠানে আজ তাঁকে ডাকা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত গোটা স্কুলটি আজ তার পরামর্শ মত পরিচালিত হয়। সমাজের অনেক শিক্ষিত নারী আজ তার মত হতে চায়। আজ মুক্তাগাছার তৃণমূল পর্যায়ে লুৎফার গড়ে তোলা সংগঠনটিকে দুস্থ ও নির্যাতিত নারীদের আশা আকাঙক্ষার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এটুকু অর্জন তাকে পরিতৃপ্ত করে।

সাজেদা মেম্বার হতে চায়

অচিন্ত্য রায় চৌধুরী

গুণ গুণ করে গান গাওয়া আর বই হাতে নিয়ে স্কুলে যাওয়া। স্কুল থেকে ফিরে গোল্লাছুট, বউছি খেলা এভাবেই দিন কাটছিলো সাজেদার। মা-বাবার প্রথম সন্তান। দাদা-দাদি, মা-বাবা সকলের অনেক আদরের। সাজেদার সব আবদার পূরণ করতে হতো। বাবা সাঈদুর রহমান পেশায় গ্রাম্য ডাক্তার এবং পাশাপাশি কৃষিকাজের সাথেও জড়িত। সাজেদারা পাঁচ বোন ও চার ভাই। তার ইচ্ছা লেখাপড়া শিখবেন, গানবাজনা করবেন মানুষের মত মানুষ হবেন। ছোটবেলা থেকেই তার গান গাওয়া ও কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। স্কুলে পড়ার সময় তিনি তার গ্রামের মোল্লাবাড়ির এক চাচার বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শিখতেন গোপনে। বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তার পরিবার অনেকটা রক্ষণশীল ছিল ।

সাজেদা যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন, তখন থেকেই তার চাচাতো ও ফুফাতো ভাইয়েরা তাকে বিয়ে করার জন্য উত্ত্যক্ত করতো। কিন্তু সাজেদা বিয়ের কথা তখন চিন্তাই করেননি। তার ইচ্ছা লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হওয়া। পরিবার থেকেই চাপ আসতে থাকে বিয়ের জন্য, কিন্তু পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সমস্যা এতই প্রকট যে, সাজেদাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়ে করাতে বাধ্য করা হয়। সে সময় সাজেদা জানতেন না কেমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। ছেলের বড় ভাইয়ের খুবই আগ্রহ ছিল সাজেদাকে তার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বউ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাজেদা যখন নবম শ্রেণির ছাত্রী ও বয়স পনের বছর, ঠিক তখনই বাবা বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী জিয়াউদ্দীন একজন মুক্তিযোদ্ধা ও তার বয়স তখন বত্রিশ বছর। বাড়ি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের তুমুলিয়া গ্রামে।

সাজেদার সংসার শুরু হলো। যৌথ পরিবার। স্বামীর সংসারে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০-১২ জনের মতো। বিয়ের পর স্বামী মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। সাজেদা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে একটা মানসিক ভারসাম্যহীন অসুস্থ স্বামীকে পেলেন। যৌথ পরিবার, বয়স কম, কর্তব্য, সংসারের কাজকর্ম প্রভৃতি দায়িত্ব তাকে অনেকটা চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে নামের পরিবর্তন হয়ে শিল্পী রহমান সাজেদা নামে তিনি পরিচিত হলেন শ্বশুরবাড়িতে। তার বড় ভাসুর সাজেদাকে বিয়ে দিয়ে অনেকটা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। সাজেদা ভালো গান গাইতেন ও কবিতা লিখতেন। তাই বড় ভাসুর তাকে আদর করে ‘শিল্পী’ নামে ডাকতেন।

সাজেদা শ্বশুরবাড়িতে করুণার পাত্র হয়ে ছিলেন। সংসারের সকল কাজ সামলানোর পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যদের হুকুম তামিল করতে হতো। কারণ একটাই, তার স্বামী অসুস্থ ও কাজ কর্মে অক্ষম। ফলে সাজেদার মানসিক যন্ত্রণা ছিল খুব বেশি। এভাবেই বিয়ের প্রথম বছর কাটতে না কাটতেই তাদের পরিবারে এক নতুন অতিথির আগমন ঘটে। সাজেদার কোলে আসে এক কন্যাসন্তান। সাজেদা খুব চাপা স্বভাবের। তার সমস্যার কথা সহসা তার মা-বাবার কাছে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সমস্যা যে একটা আছে সেটা তারা এক পর্যায়ে বুঝতে পারেন। ইতোমধ্যে প্রথম সন্তান জন্মের ঠিক এক বছর পরেই আবার দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তারপরই সাজেদার বাবা তার মেয়েকে আর শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু সাজেদা সিদ্ধান্ত নেন তিনি শ্বশুরবাড়িতে যাবেন এবং এই স্বামীকে নিয়েই সংসার করবেন। এর মধ্যে গোপনে সাজেদার চাচাতো ভাই সাজেদাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সাজেদা রাজী হন না। তিনি মনে করেন বিয়ে মানুষ একবারই করে। বিয়ে আর তিনি করতে রাজী হন না। এভাবেই সাজেদার পরে আরো দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তিনি বর্তমানে চার কন্যা সন্তানের জননী।

অভাব অনটনের সংসারে সাজেদা চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নেন। মিরপুরে তার মামার কাছে চাকরির কথা বললে তিনি সাজেদাকে গার্মেন্টসের চাকরি যোগাড় করে দেন। অতিকষ্টে সাজেদা তার মেয়েদের মানুষ করতে থাকেন। তবে সাজেদা তার মামাবাড়িতে থেকে চাকুরি করলেও তার বড় ভাসুর তার সংসারের কিছুটা ভরণপোষণ বহন করতেন। ছয় বছর চাকুরি

করার পর সাজেদা আবার শ্বশুরবাড়ি কালীগঞ্জে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে 'কারিতাস' নামের একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ সহযোগিতা নেন। ঋণের টাকায় সেলাই মেশিন কিনে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। সেলাইয়ের কাজ শুরু করার কারণে সাজেদার আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে। তিনি স্বামীর পেটের টিউমার অপারেশন করে স্বামীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলেন। স্বামী এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। সাজেদা ব্র্যাকসহ নানা সংগঠনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। এলাকার নারীনেত্রী নাহিদ সুলতানার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক নামক সংগঠনের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

২০০৮ সালের জুলাই মাসে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাজেদা নিজেকে আরো প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহী হন। বর্তমানে তিনি গ্রামের নারীদের নিয়ে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। ভবিষ্যতে তার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে, কারণ তিনি মনে করেন এর মাধ্যমেও অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়াও ৩০ জন নারী নিয়ে 'পল্লী–সমাজ' নামে একটি নারী সংগঠন তৈরি করেন ২০০৭ সালের জুলাই মাসে। গ্রামের নারীরা যেন এই সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে কাজের সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যেই তিনি এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সাঈদা: অসহায় মানুষের পাশে
মো. আসলাম খাঁন

পৃথিবীতে মানুষ অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। একসময় মরেও যায়। রেখে যায় স্মৃতিময় কর্ম, যা মানুষকে স্মরণীয় করে রাখে। যার উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তিনি সাঈদা আক্তার। সাঈদার জন্ম ১৯৬৯ সালে ২০ সেপ্টেম্বর জামালপুর জেলার পাথালিয়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। পাথালিয়া গ্রামটি শহরের উপকেন্দ্রে অবস্থিত। বাবা মৃত মোতাহার আলী, মা মৃত ছাকিনা খাতুন। বাবা আনছার ছিলেন। পরে অবশ্য ব্যবসা করতেন। ১০ ভাইবোনের মধ্যে সাঈদা সপ্তম। একছেলে আর এক মেয়ের জননী সাঈদার বয়স এখন প্রায় ৪০ বছর। বড়ভাই বোনের মধ্যে সবাই কমবেশি লেখাপড়া করেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বেশ শান্ত। সপ্তম অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালে সাঈদার স্কুলে যাবার পথে পড়তো দাতব্য চিকিৎসালয়। সেই চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে নিজের নামে ওষুধ উঠিয়ে গ্রামের অসহায়, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। এটিই যেন ছিলো তার নিত্যদিনের কাজ। গ্রামের অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পারলে তার খুব ভালো লাগতো। খুব খুশিও হতেন। এভাবে মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়ে সামাজিক কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়।

তারপর থেকে সাঈদার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় বড় হয়ে ডাক্তার হবেন। ডাক্তার হয়ে অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত মানুসের সেবা করবেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাঈদা রেডক্রিসেন্টের সাথে যুক্ত হন এবং রেডক্রিসেন্টের মাধ্যমে বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে সেই কৈশোরেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, অসহায় মানুষের জন্য তার প্রাণটা মাঝে মধ্যেই অস্থির হয়ে ওঠে। কখনও বা ভাবেন বড় হয়ে এইসব মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন। তার কচি মনটা অসহায় মানুষের জন্য কাঁদে- কিন্তু তার সাধ আছে,সাধ্য নেই।

সাঈদা স্বপ্নপূরণের জন্য নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। ১৯৮৬ সালে এসএসসি পাশ করেন। তারপর ১৯৮৯ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাঈদা সেবামূলক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তার শিক্ষকগণ ও পরিবারের সদস্যরা তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। এতে করে সাঈদার মনোবল আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর সাঈদা আর্থিক সংকট এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে এমবিবিএস ডাক্তার হতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি তার স্বপ্ন একেবারে বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। সাঈদা তার সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য সরিষাবাড়ি উপজেলা হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৯৬ সালে উক্ত কলেজ থেকে ডিএইচএমএস পাশ করেন।

সাঈদার বাবা একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আত্মীয় স্বজন সবাই দেখতে এসেছে। বাবার অসুস্থতার মধ্যে বাড়িতে কিসের যেন আয়োজন চলতে থাকে। সেদিন পরিবারের সবাই ব্যস্ত এবং চঞ্চল। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? এত সব কিছু কিসের আয়োজন? এইসব বিষয় সাঈদাকে ভাবনায় ফেললেও সে কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে পারছে না। তার চোখে মুখে শুধু মুমূর্ষ বাবার প্রতিচ্ছবি। আনন্দের কোনো ছোঁয়া নেই।

মুমূর্ষ বাবাকে দেখতে অনেক জায়গা থেকে অনেক লোকজন আসছে। অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসা লোকদের মধ্যে থেকে সাঈদাকে পছন্দ করে এবং সেই দিনই বিয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। তখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ তার কাছে সংবাদ এলো, তার বিয়ে হবে আজ রাতে। একদিকে মুমূর্ষ পিতা অন্যদিকে বিয়ে। অনিচ্ছা স্বত্তেও সাঈদাকে সেদিন বিয়েতে রাজী হতে হলো। কারণ বিয়েতে রাজী না হলে তা হবে বেয়াদবী, অভিভাবকদের অপমান করা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে এমনই কিছু নিয়মনীতি। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কোনো কিছু বলার মতো সৎ সাহস তার ছিলো না। তার স্বামীর নাম এহতেশামুল হক(ফুরান)। তিনি *অগ্রগতি* নামে একটি সামাজিক সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক। বর্তমানে সংগঠটির তেমন কোনো কার্যক্রম নেই।

বিয়ের পরের দিনই সাঈদার বাবা মারা যান। তার মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়লো। বাবার মৃত্যুর পরে সাঈদার সংসারে অভাব অনটনের সূচনা হয়। একদিকে সংসার, অন্যদিকে জনসেবা। তখনো সাঈদা রোগী দেখে কোনো টাকা নেন না। এমনকি নিজের কেনা ওষুধ দিয়ে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করতে থাকেন। সাঈদা আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ(দর্জি বিজ্ঞান), ব্লক বাটিকের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার সেবা করার মানসিকতা দেখে এলাকার লোকজন তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন। এলাকার জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে সাঈদা ১৯৯৯ সালে সদর উপজেলার পৌরসভার কমিশন পদে নির্বাচন করেন এবং জনসাধারণের ভোটে কমিশনার নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, তার নির্বাচনের অধিকাংশ খরচ এলাকার জনগণ বহন করেন। নির্বাচনের একদিন পরেই তার মায়ের স্ট্রোক হয় এবং প্রায় দুমাস অচেতন থেকে তিনি ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল মারা যান।

বাবা মায়ের মৃত্যুর পরও সাইদার মনোবল একটুও কমেনি। নিজের সংসার পরিচালনার চেয়ে তার কাছে জনসেবাই যেন বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন, অন্যদিকে এলাকায় অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য *'সৃষ্টি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা'* নামে একটি সংগঠন দাঁড় করিয়েছেন। এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে সাঈদা। সমিতির সদস্য সংখ্যা তিনশো জনের মতো। নয় সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি আছে। এ কমিটির মাধ্যমে সংগঠনটি পরিচালিত হয়। সংগঠনটি সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত। এছাড়া তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থার সহযোগিতায় মিনি গার্মেন্টসের উপর ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সাঈদা দুর্বার নেটওয়ার্ক ও পুলিশিং কমিটিসহ বিভিন্ন সংস্থার ও কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সাঈদা এক সময় জানতে পারেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নামক স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনের কথা। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আহ্বানে ২০০৬ সালে পূর্বাঞ্চলের ময়মনসিংহে *'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'*-এর ২য় ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়। এ প্রশিক্ষনের ফলে সাঈদার জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। পাল্টে দেয় তার চিন্তা চেতনাকে। শুরু হয় এক নতুন অগ্নিপরীক্ষা। তারপর তিনি এলাকার নির্যাতিত, বঞ্চিত, অবহেলিত নারীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন ধরনের কাজ করে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে থাকেন। পাশাপাশি বেকার মেয়েদের আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য নিজে পঞ্চাশ হাজার এবং এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে মোট দেড় লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন সমিতিতে। বাইরে থেকে সেলাইয়ের বিভিন্ন ধরনের অর্ডার নিয়ে সমিতির সদস্যদের নিয়ে কাজ করান এবং যাদের নিয়ে কাজ করান তাদেরকে কাজের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দেন। এখন সমিতির সদস্যরা নিজেরাই সেলাই মেশিন কিনেছেন এবং বাড়িতে বসে কাজ করে সমিতিতে জমা দেন। অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছেন। প্রতিমাসে সমিতি থেকে সাঈদার পনেরো হাজার টাকার মতো আয় হয়, যা দিয়ে তিনি তার সংসারের খরচ চালান।

এরপরে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে ২০০৮ সালের মাঝামাঝির দিকে ১৩৪৭তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সাঈদার আত্মশক্তি যেন আরো বেড়ে গেলো। আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারেনা– এই মন্ত্রই যেন সাঈদাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাঈদা সামনে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পান।

আরও বৃহত্তর পরিসরে জনগণের সেবা করার জন্য সাঈদা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি; কিন্তু এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে সাঈদা বলেন,'ভবিষ্যতে বেকার মেয়েদের জন্য গার্মেন্টস কারখানা করার ইচ্ছা আছে। বঞ্চিত, অবহেলিত নারীদের সবসময় যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করতে চাই'। তাছাড়া ভারতের

কলকাতা থেকে BHMS ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তারি পেশার মাধ্যমে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করারও ইচ্ছে আছে তার। তিনি এমন কাজ করে যেতে চান যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাকে স্মরণ করেন।

নারীদের অধিকার সমন্ধে সাঈদা তার সমিতির সকলকে সচেতন করে সংগঠিত করেছেন। নারী নির্যাতন বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কোথাও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তার তীব্র প্রতিবাদ করে জনগণের সেবা করা যেন তার নেশা ও পেশায় পরিণত হয়েছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জামালপুরে সাঈদা যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তার ধারাবাহিকতায় অন্তরালের ঘটনাগুলোও বাইরে বেরিয়ে আসবে। সংগঠিত হবে সামাজিক প্রতিরোধ, গড়ে উঠবে নারী পুরুষ বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ। যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র, অবিচার, অনাচার– এটাই সাঈদা আক্তারের প্রত্যাশা।

সব বাধাই হার মানলো

নায়লা হক দীনা

মালতি রানী দেবী। জন্ম কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানায় ১৯৮২ সালে। মালতির জন্মের সময় তার বাবা সন্তোষ চন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন কাপড়ের দোকানদার। চার ভাই বোনের মধ্যে মালতির ভাই তার দু বছরের বড়, এছাড়া আছে মালতির ছোট দুই বোন। মালতির জন্মের সময় সংসারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল, কোনো কিছুর অভাববোধ হয়নি কখনও। নিয়তির নির্মম পরিহাসে মালতির বয়স যখন পাঁচ তখন মালতি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু সচেতনতার অভাব এবং কুসংকারাচ্ছন্ন থাকার ফলে তার পরিবারের লোকজন তাকে কোনো ডাক্তার না দেখিয়ে বরং ঝাড়ফুঁক, কবিরাজি ও তাবিজ-কবজের চিকিৎসা করায়। মালতি বিছানায় অসার হয়ে পড়ে থাকে। তিন বছর প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করার পর মালতি আস্তে আস্তে ভাল হতে থাকেন এবং তার বাম পায়ের চলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করেন। মালতি যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন, তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। অনেকেই পরিবারের এই দুর্গতির জন্য মালতিকে দায়ী করে। তারা সবসময় মালতিকে অলক্ষ্মী, অপয়া বলে ডাকতো।

মালতির অসুস্থতার সময় তার আরো একটি বোন হয়। সংসার খরচ চালানোর জন্য পরিবারের সবাই মিলে বিড়ি বানানোর কাজ শুরু করে। পড়াশুনায় প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার কারণে মালতিও স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতেন বলে সহপাঠীরাও অনেক সময় তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো। কিন্তু মালতি দমেননি। স্কুল থেকে আসার পর মালতিকে সংসারের কাজে মাকে সবসময় সাহায্য করতে হতো আর বিড়ি বানানো চলতো রাত পর্যন্ত। মালতির পরিবারের সদস্য আরও একজন বাড়লো। বাবার আয়ে কোনো রকমে সংসারের খাবার খরচ চলে। তিনবেলা পেটভরে খাবার জুটতো খুব কম দিন। এমনিভাবে মালতি যখন অষ্টম শ্রেণীতে ওঠেন তখন থেকে মালতি প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেন। মাসে ৩০০/- দিয়ে একটি ডিপিএস খোলে। সকালে স্কুলে যাবার আগে দুইটা স্কুল থেকে আসার পর সংসারের কাজ শেষ করে আবার বিকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলত প্রাইভেট পড়ানো। অষ্টম শ্রেণীতে থাকার সময় মালতি টিএলএম (গণশিক্ষা কার্যক্রম) থেকে পনের দিনের একটি প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণ তার পড়াশুনার দক্ষতা আরো বাড়ে। সংসারের নানা সমস্যায় মালতির মা বীণা রানী কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ফলে সংসারের সব দায়িত্ব মালতির কাঁধে এসে পড়ে। বাবার আয়ে সংসারের খাবার খরচ কোনো রকম চলত আর মালতিকে দিতে হতো ছোট দুই বোনের পড়ার খরচ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস।

মালতির ভাই এসএসসি পাশ করার পর ঢাকা চলে যায় এবং সেখানে চাকরি করে কিছু টাকা সংসারেও দিতো। এইদিকে মালতির বয়স বেশি হলেও একটি পা নষ্ট থাকায় তার বিয়ে হচ্ছে না। তাই ছোট বোনদের বিয়ে নিয়েও মানুষ নানা কথা বলতো। মালতি যখন দশম শ্রেণির ছাত্রী, তখন তার ছোট বোনের বিয়ে হয়। ছোট বোনের বিয়ের পর মালতি তার প্রাইভেট পড়ানো আরো বাড়িয়ে দেন। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, ফলে নিজের পড়াশুনার ক্ষতি হয় এবং তিনি এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করতে ব্যর্থ হন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এই পর্যায়ে মালতিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। সংসারের যাবতীয় কাজ আর টিউশনি এইভাবে সর্বক্ষণ নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। বড় হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে না হওয়ায় এলাকার লোকজন মালতিকেই দায়ী করে। কিছুটা স্থির হওয়ার পর মালতি আবার এসএসসি পরীক্ষা দেন কিন্তু আবারও অকৃতকার্য হন। তৃতীয় বারের মাথায় ২০০৪ সালে মালতি এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন। এসএসসি পাশের পর মালতি এইচএসসি তে ভর্তি হন।

কলেজে ভর্তির পর মালতি কম্পিউটার শেখার জন্য হাবিবুর রহমান বর্ণালীর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হন। এখানে কম্পিউটার শেখার সময় মালতি জানতে পারেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ হবে। মালতিও '৬৬১তম' ব্যাচে উজ্জীবক হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মালতি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করেন। সেই লক্ষ্যে

তিনি ঢাকা গিয়ে 'বিউটিফিকেশনে' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কটিয়াদি আসার পর মালতি প্রথমে নিজের পরিচিতদের মাঝে পার্লারের কাজগুলো করতেন। এর মধ্যে এইচএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মালতি ফরম পূরণও করেন। কিন্তু হঠাৎ করে বাধার সৃষ্টি হয়। মালতির ছোট বোন সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য সে বাপের বাড়িতে চলে আসে। ছোট বোনের প্রতি সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মালতির পক্ষে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া আর সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার পর মালতি বাড়ির পাশের এক পার্লারে কাজ নেন; সেটি ছিল তার বান্ধবীর। পাশাপাশি টিউশনিও চলতে থাকে। বান্ধবীর সাথে মনের মিল না হওয়ায় মালতি নতুন একটি পার্লারের দোকান দেন। কৃষি ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং অনামিকা নামে এক বান্ধবীর সাথে যৌথ উদ্যেগে পার্লারটি প্রতিষ্ঠা করেন। দোকানের সম্পূর্ণ টাকা মালতি দিয়েছিলেন। কথা ছিলো, অনামিকা ধীরে ধীরে তার অংশের টাকা শোধ করে দেবেন। কিন্তু অনামিকা প্রতিমাসে মারতির কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন। তাই তার অংশের টাকা কোনদিনই শোধ করা হয়নি।

এমনিভাবে একটি বছর পার হয়ে যায়। পার্লারের দোকান চালাতে গিয়ে মালতির সাথে পরিচয় হয় রাজশাহীর ছেলে সুমন সাহার। দু'জনে নতুন সংসারের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সুমনের বাবা, মা বা পরিবারে কেউ না থাকায় বাধ সাধে মালতির পরিবার। কিন্তু এবার আর বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে মালতি ব্যর্থ হতে দেননি। পরিবারের অমতে নিজের পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করেন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মালতি স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাসায় ভাড়া থাকেন। বিয়ের পর স্বামীর সাথে দোকানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর স্বামী তাকে পরামর্শ দেয় শেয়ারের টাকা নিয়ে কথা বলার জন্য। স্বামীর পরামর্শে অনামিকার সাথে এ নিয়ে কথা বলায় আবারও সমস্যার সৃষ্টি হয়। এদিকে মালতি আগে যে পার্লারে কাজ করতেন, তা ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখিন হয় ও বন্ধ হয়ে যায়। মালতি চেয়েছিলেন সে দোকানটি কিনতে। দোকানের মালিক শেষ পর্যন্ত তার দোকানটি মালতিকে বিক্রি করেননি। এদিকে অনামিকার সাথেও ব্যবসায়ীক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

ফলে মালতি এবার একাই একটি পার্লারের দোকান দেন কটিয়াদি মহিলা কলেজের সামনে। পূর্বের দোকানের মালামাল অনামিকা ও মালতি দু'জনে ভাগ করে নেন। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে মালতি তার 'বকূয়া বিউটি পার্লার' উদ্বোধন করেন। নতুন দোকান নিয়ে মালতি নতুনভাবে সংগ্রামে নামেন। পার্লারের পিছনেই তার বাসা। বর্তমানে পার্লার থেকে মালতির মাসিক আয় ২৫০০/- টাকা। এছাড়া তার প্রাইভেট পড়ানো থেমে যায়নি।

মালতি এখন তার অসম্পূর্ণ পড়াশুনা আবারও নতুন করে শুরু করতে চান। মালতি এইচএসসি পরীক্ষা দেবার প্রত্যাশা করছে। তার স্বপ্ন, দোকানটা আরও বড় করবে ও সুন্দর করে সাজাবে।

সাহস করেই স্বপ্ন দেখি

সরস্বতী রানী পাল

১৯৭১ সাল। সারাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেরই ছোটবেলায় হয়তো মুক্তিযুদ্ধের এমন স্মৃতি আছে যা নেহায়েত কিশোরীবেলার এক স্মৃতি নয়; যে ঘটনাটি চিরকাল মানুষকে প্রেরণা জোগায়। বাড্ডার সেলিমা মসির জানালেন, তার শৈশবস্মৃতির কিছু ঘটনা। সে সময়ের অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে তিনি জানালেন–

'একাত্তরে আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ঠিক তার দু বছর আগে আমার বিয়ে হয়। ঢাকায় বাবার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতাম। মাঝে মধ্যে সিলেটে বেড়াতে আসতাম। যুদ্ধের সময় পুরোপুরিই সিলেটে চলে আসি। অনিশ্চয়তার সময়েও ঘর-সংসারের ফাঁকে দু সন্তান মানুষ করা আর অবসরে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি। ফলে যুদ্ধোত্তর সময়ে কী করব– এমন অনিশ্চিয়তা ছিল না।'

সেলিমার জন্ম বরগুনা জেলার নাচনাপাড়া গ্রামে ১৯৪৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। বাবা আব্দুল কুদ্দুস ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের কর্মকর্তা। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইং ক্লাবের প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেছেন। মা শামসুন নাহার মাহ্মুদ ছিলেন গৃহিণী। তিন বোনের মধ্যে সেলিমা ছিলেন সবার বড়। দু বোনের একজন সানজিদা খাতুন নিউজিল্যান্ডে, অন্যজন তসলিমা খাতুন আমেরিকা প্রবাসী। কিন্তু সেলিমা মসির তার বাবার আদর্শ এবং স্বপ্নকে লালন করে দেশেই কিছু করতে চেয়েছেন। আর সেজন্য ছিল তার নিরন্তর চেষ্টা।

বাবার কর্মস্থল ছিল পাকিস্তানে। তাই জন্ম বাংলাদেশে হলেও শৈশব এবং কৈশোরের অনেকটা সময়ই সেলিমার কেটেছে পাকিস্তানের করাচির ড্রিগ রোড এবং মৌরীপুরে। এই দু জায়গায় পরিবারের সবার সাথে কলোনিতে অবস্থান করতেন। সেখানে সেলিমা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তবে সেখানে বাংলা মাধ্যম না থাকায় বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। তার কোনো ভাই ছিল না। তাই বাবা আব্দুল কুদ্দুস তার বড় সন্তান সেলিমাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়তে চেয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালে বাবা পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসেন। পরিবারের সাথে সেলিমা মসির আবার চলে আসেন ঢাকার বাড্ডায়। এ সময়ে পারিবারিক সম্মতিতে তিনি বিয়ে করেন। পাত্র মসির উদ্দীন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা ছাত্র। জীবন চলার পথে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করবে বলে বিয়েতে সেলিমার দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। স্বামীর কর্মস্থল ছিল সিলেটের শাহ্জী বাজারের সাথে। তাই বিয়ের পর তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। শুরু হয় তাদের সংসার জীবন। এ সময় প্রসঙ্গে সেলিমা মসির বলেন- সংসার জীবনের দু বছর বেশ ভালোই কাটে। সাংসারিক কর্ম করেও ঘুরতে যাওয়ার সময় থাকত হাতে। ঘরে বসে অবসরে পড়াশোনা করারও অবারিত সুযোগ ছিল। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের সনদপত্র পাকিস্তান থেকে আনা হয়নি। তাই তিনি বাবার সাথে যোগাযোগ করে সনদপত্র আনানোর ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে তার স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা এবং বাবার সার্বক্ষণিক যোগাযোগের কারণেই পুনরায় পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় বলে জানালেন সেলিমা মসির।

উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন সেলিমা। কিন্তু সেটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উত্তাল সময়। তাই খুব বেশি দিন ক্লাস করা সম্ভব হয়নি। ক'দিন পরেই ফিরে যান সিলেটে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সংসার ও সন্তান প্রতিপালনের পাশাপাশি চলে তার অর্নাস ও মাস্টার্সের পড়া। ১৯৮০ সাল। পড়াশুনা শেষ করেছেন সেলিমা মসির। সংসারও গুছিয়ে নিয়েছেন অনেকটাই। তাই নিজের তাগিদবোধ থেকে ঘরে বসেই কিছু করা কিংবা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে চাইলেন। সুযোগও মিলে যায়। বাড্ডায় 'Urban Development Project for women'- এ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে

কাজের সুযোগ মেলে। করিৎকর্মা সেলিমা মসির মাত্র অল্প ক'দিনেই 'জাতীয় মহিলা সংস্থা'র বাড্ডা এলাকার উক্ত প্রজেক্টের মূল দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে প্রতিদিন দু ঘণ্টার (দুপুর ২.০০ থেকে বিকেল ৪.০০) দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। প্রজেক্টে ছিল মূলত চারটি সেকশন। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা, তাঁত বুনন, সুঁচিকর্ম এই চারটি বিভাগে ১৫ জন করে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিল। ছয় মাস অন্তর নতুন প্রশিক্ষণার্থীর টিম আসত। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিদিন ২ টাকা ফি প্রদান করা হতো। এছাড়া তাদের কর্ম-মূল্যায়নের ভিত্তিতে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হতো।

প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী যেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে সক্ষম হন সেলিমা মসিরের নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল। প্রজেক্টের আওতায় দায়িত্ব পালনের সময় নারীদের স্বনির্ভর করার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি নিশ্চিত করেছেন শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক অধিকারসমূহ। দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় এই স্বেচ্ছাশ্রমের কাজটি করতে গিয়ে তিনি নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সেলিমা মসির কাজগুলো চালু রেখেছেন নিজের মনোবল আর সাহসের গুণে। তার ভাষায়, 'নানাজন নানা কথা বলতেন। স্বেচ্ছাশ্রমের বিষয়টি কেউ বিশ্বাসই করতেন না। কিন্তু অতি শৈশবে বাবার কাছ থেকেই শিখেছি পরোপকারে কিছু সময় উৎসর্গ করতে হয়। সমাজ থেকে নেওয়া এবং দেওয়া দুই-ই সমানভাবে মানুষের জীবনে প্রযোজ্য।' তিনি আরো বলেন, 'মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা, আর সম্মানকে বড় করে দেখেছি; যা একজন পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।'

স্বেচ্ছাশ্রমের এ পর্যায়ে সেলিমা মসির রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। সমাজসেবার মানসিকতা থেকেই তিনি রাজনীতি করেছেন বলে জানালেন। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি এলাকায় নাগরিক সচেতনতা বিষয়ে তার আন্দোলনের চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। ফলে বাড্ডায় তার নানামুখি কার্যক্রমের বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। এ সময়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিকে নানা কাজের সাফল্যে সকলকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টির জন্য একদিন চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে পাঠান। সেদিন মহিলা কমিশনারের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে তার মৌখিক সিদ্ধান্তটি আমাকে বিস্মিত করে!'

দু দিন পরের ঘটনা। দৈনিক পত্রিকায় মহিলা কমিশনার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত নিজের নামটি দেখতে পেয়ে সেলিমা মসিরের মনে হয়- 'অনেকে চেষ্টা করে, শত তদবির করেও যে সুযোগটি সবাই পায় না, আমি তা অতি সহজেই পেয়েছি।' বিশ্বাস না হলেও বিষয়টি সত্যি। তাই বিশ্বাসের সাথে বেড়ে যায় দায়িত্ব ও এলাকায় কাজের পরিধি। গুলশান থানাধীন মহাখালী, গুলশান (১,২), বনানী, শাহ্জাদপুর, বাড্ডা, রামপুরা (আংশিক) ছিল তার দায়িত্ব পালনের এলাকা। তিনি দীর্ঘ আট বছর এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে তিনি মানবাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন, সামাজিক বৈষম্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ, তালাক, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত প্রভৃতি বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে তার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল গুলশান-বাড্ডা লিঙ্ক রোডের কাঁচা সড়ক পাকা করা।

মহিলা কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় শেষ হলেও দায়িত্বশীল সেলিমা মসিরের চলমান কাজগুলো শেষ হয় না। তাই চলমান থাকে তার স্বেচ্ছাশ্রম। এলাকায় সমাজসেবার সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টিই মূলত অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময়ে এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এন ইসলাম তপন চৌধুরীর (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা কমিটি, সুজন) সাথে কথা হয় উজ্জীবক প্রশিক্ষণ বিষয়ে। ২০০৬ সালে লালমাটিয়া 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'- এ অনুষ্ঠিত ১০০০তম ব্যাচে সেলিমা মসির উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মানুষ কীভাবে যে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তা বুঝতে সক্ষম হন তিনি এই প্রশিক্ষণে। এছাড়া যৌথ চিন্তার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত সমাধানের বিষয়টিও জানতে পারেন তিনি। তার ভাষায়, 'প্রশিক্ষণ জানার পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে আগের চেয়ে বহুগুণ। সবচেয়ে বড় কথা– নিজে আত্মনির্ভরশীল ছিলাম, কিন্তু অন্যকে আত্মনির্ভরশীল করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলাম।'

সেলিমা তার জীবনের শুরু থেকেই বহুবিধ কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। কাজও করেছেন অনেক। কিন্তু উজ্জীবক প্রশিক্ষণে তিনি তার অনেক কাজের একটি গুছানো রূপরেখা পেয়েছেন বলে মনে করেন। প্রশিক্ষণের পর প্রতিটি কাজ এবং দায়িত্ব পালনের পূর্বে একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন। এটি তার চলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। প্রশিক্ষণের পরে শুরু হয় তার আরেক পথ চলা। এলাকায় শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলেন 'আবাবিল একাডেমি' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পবিত্র কোরানে বর্ণিত একটি পাখির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের নীতি হলো 'সত্য ক্ষুদ্র হলেও বৃহৎ অন্যায়কে ধ্বংস করতে পারে।' সেই সত্যকে ধারণ করে সেলিমা মসির শিক্ষার আলোকবর্তিকা তুলে ধরেন। মাত্র কুড়ি জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু করেছিলেন তার শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে দশ জন শিক্ষিকা এবং ২০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি চলছে আর্ট, সঙ্গীত, নৃত্য এবং কম্পিউটার বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা। এছাড়া ভবিষ্যতে বাংলার সাথে ইংরেজি মাধ্যম করা এবং স্কুলটিকে মাধ্যমিক শ্রেণিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা চলছে। মনোগত দিক আরো শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য ও শিক্ষিকাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দেন। নিজ উদ্যোগে এলাকায় ২টি উজ্জীবক প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করেছেন। এছাড়া স্বেচ্ছাশ্রমের দৃঢ় মানসিকতা থেকে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের নানামুখী কার্যক্রমে।

সেলিমা মসির ১৯৮৮ ও ১৯৯২ সালের ভয়াবহ বন্যায় এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে গঠন করেছিলেন বিশেষ রিলিফ ক্যাম্প। সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাড্ডা এলাকায় সেলিমা মসিরের নেতৃত্বে স্থানীয় উজ্জীবকগণ বিভিন্ন স্থানে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। সে সময়ে সেলিমা মসির তার সাধ্য অনুযায়ী বন্যার্তদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। বন্যার্তদের সহযোগিতার লক্ষ্যে এলাকায় ঘুরে ঘুরে অর্থ, পুরনো কাপড়, খাবার সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থের নগদ বিশ হাজার টাকা, নয় বস্তা পুরাতন কাপড় এবং ত্রিশ কেজি চাউল দি হাঙ্গার প্রজেক্টে জমা দেন। ১১১৯তম ব্যাচের উজ্জীবকদের সহায়তায় ২১নং বাড্ডার এই প্রশংসনীয় উদ্যোগটির সাথে তিনি সম্পৃক্ত করেছিলেন এলাকার রিয়াজুল ইসলাম, রিয়া, রাজু, নাসরীন, হাসান, সোহেলী, মহসিন, মঈনউদ্দীন, শফিক, মিলা, চায়না, লিপু, বেবী, সালমা, সেলিনাসহ আরও অনেককেই।

স্বেচ্ছাশ্রমের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে তার কাজগুলো ছিল:

কার্যক্রম	স্থান	২০০৭	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			নারী	পুরুষ	মোট
মতবিনিময় সভা: সামাজিক সচেতনতা	আবাবিল একাডেমী মধ্যবাড্ডা	৩ আগস্ট	১৫	৭	২২
বন্যার্তদের সাহয্যের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ	বাড্ডা	২১ আগস্ট	১৩	৮	২১
ত্রাণ হস্তান্তর	হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ	১২ আগস্ট	-	-	-
অভিভাবক সমাবেশ: 'আমাদের সমাজে কন্যাশিশুর লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ কম'	আবাবিল একাডেমী জ-১২০, মধ্যবাড্ডা	৫ নভেম্বর	১৫	১০	২৫
আলোচনা সভা: পরিবার পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ	আবাবিল একাডেমী জ-১২০, মধ্যবাড্ডা	৫ নভেম্বর	৯	১৫	২৪

এছাড়া সেলিমা 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'- এর বাড্ডা থানার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সাথে যুক্ত আছেন বর্তমানে 'নাসফ-নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম'- এর বাড্ডার ২১নং ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্বে (২০০৫-২০০৮), 'শেকড় মানবকল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এর উপদেষ্টা হিসেবে দু বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করছেন।

অর্পিত দায়িত্বকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নিশ্চিত করতে গিয়ে সেলিমা মসিরকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার ভাষায়, 'সকল বাধাকে অতিক্রম করেই এগিয়ে গিয়েছি।' আরও বলেন, 'স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব– এলাকায় এই দৃষ্টান্তটি প্রতিষ্ঠিত করেছি। যতদিন বেঁচে আছি ততোদিন মানব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করব।

মূলত মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ বা অনুপ্রেরণা সেলিমা মসির পেয়েছেন তার বাবার কাছ থেকেই। বাবা সব সময়ই চাইতেন দেশের জন্য কিছু করতে। আর সেই ইচ্ছাপূরণ করতে চাইতেন তার সন্তানদের মধ্য দিয়েই। বড় সন্তান হিসেবে সেই ইচ্ছাপূরণ যেন অলিখিতভাবে আমার কাঁধেই এসে পড়ে। সন্তানকে গড়ে তোলার আদর্শগুলো শুধু বুলি আওড়ানো নয়, কাজেও পরিণত করে দেখাতেন। সেই বাস্তবতার স্বপ্নকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমার নিরন্তর ছুটে চলা।

'ঘরে মূল্যায়ন করে সবাই– এটিই সবচেয়ে বড় পাওয়া।' এ প্রসঙ্গে বড় মেয়ে মাসুমা খানের (কানাডা প্রবাসী) কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কমিশনারের দায়িত্ব পালন কালে অন্য সন্তানদের সে দেখাশুনা করতো। অস্থির সময়ে ঘরে ফিরে আমাকে খুব বেশি ভাবতে হত না।' এটি ছিল এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। এছাড়া পুত্র জলিল উদ্দীন, সালাউদ্দীন এবং মেয়ে মাহবুবা খানসহ (প্রত্যেকেই বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত) পরিবারের সবারই খুব সহযোগী। এ সকল কথাই অবসরে ভাবতে ভালো লাগে সেলিমা মসিরের। আর তাই পরিবার এবং সমাজে পরিপূর্ণরূপে দায়িত্ব পালন করে যেতে যান তিনি। ফলে প্রতিনিয়ত সাহস করেই স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জীবন চলার পথে তিনি তার বাবাকেই দেখতে পান। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন লালন করেন তিনি। অনেকের সাথে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেও এগিয়ে গেছেন অনেকটাই। তাই সেলিমা মসির বলেন, 'সাহস করেই স্বপ্ন দেখি...।'

বাঘিয়ার বাহারজান

সরস্বতী রানী পাল

একটি ঘটনা

গাজীপুর জেলার বাঘিয়া গ্রামেরমো. সফিউদ্দিন ও হামিদার মেয়ে হাদিয়া। কোণাবাড়ির আমবাগ গ্রামের মৃত রশিদ ও ছাহেরা বেগমের ছেলে মোস্তফা। ১৯৯৪ সালে পারিবারিক সম্মতিতে হাদিয়া ও মোস্তফার বিয়ে হয়। মোস্তফা গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। হাদিয়া ঘর-সংসারেই সময় ব্যয় করতেন। অভাবের সংসারে হাদিয়া তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা, ধান চাউল কাপড়সহ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস আনতেন। এছাড়া থাকার ঘর তৈরির টিন, কাঠও বাবার বাড়ি থেকে এনেছেন। সংসারের আর্থিক সচ্ছলতার কথা ভেবেই হাদিয়া গার্মেন্টেসে চাকরি করতে চান। কিন্তু মোস্তফা তাতে রাজি হন না। বলেন, 'তুমি চাকরিতে গেলে তোমগগো বাড়ি থেইক্যা সাহায্য বন্ধ অইয়্যা যাইব।' হাদিয়ার চাকরি করা নিয়ে শুধু আপত্তি নয়; চলে অকথ্য ভাষায় গালাগালাজ এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন।

বিয়ের এক বছর পরের ঘটনা। হাদিয়া প্রথম কন্যাসন্তানের মা হন। মেয়েসহ হাদিয়া বাবার বাড়িতে দু বছর অবস্থান করেন। এ সময়ে স্বামী মোস্তফা ভরণ-পোষণ তো দূরে থাক; সামান্য খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেন না। হাদিয়ার বাবা-মা শ্বশুরবাড়ি আমাবাগে যোগাযোগ করেন। এ নিয়ে গ্রামে বেশ ক'বার সালিশ বসে। মীমাংসাও হয়। কিন্তু তাতে ঘটনার প্রকৃত সুরাহা হয় না। কিছুদিন পর হাদিয়া জানতে পারেন, মোস্তফার আরও একটি বিয়ের ঘটনা। গার্মেন্টেসে কর্মরত এক কর্মীকে মোস্তফা বিয়ে করেছেন। হাদিয়া খবরটি শুনে অনেকটাই দিশাহারা হয়ে পড়েন।

পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে হাদিয়া বাঘিয়া গ্রামের 'মহিলা সেবাসংঘে'র শরণাপন্ন হন। সংঘের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে সহযোগিতা কামনা করেন। পরিচালক গ্রামের চেয়ারম্যানের সহায়তায় প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি তদন্ত করেন। ১৫ মে, ২০০৬ ইউনিয়ন পরিষদে মোস্তফার মা এবং বড় ভাইকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। প্রথমে চেয়ারম্যান নোটিশ করে মোস্তফার মা-ভাইকে হাজির করেন। কিন্তু মোস্তফা হাজির হন না। চেয়ারম্যান মা-ভাইকে সাত দিনের সময় দিয়ে মোস্তফাকে হাজির করার নির্দেশ দেন।

বাঘিয়াবাসী আইন-আদালতের চেয়ে মোস্তফার বড় ভাইকে বিষয়টি গ্রামেই মীমাংসা করার পরামর্শ দেন। গ্রামবাসী, হাদিয়া ও মোস্তফার পরিবার মিলে বসেন 'মহিলা সেবাসংঘে'। সভায় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্তক্রমে মোস্তফার দুই শতাংশ জমি হাদিয়ার নামে রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। বর্তমানে মোস্তফা ও হাদিয়া দুই জনই গার্মেন্টেসে চাকরি করেন। মেয়ে স্কুলে যায়। শুধু হাদিয়া নয়, এরকম অসহায় অনেক নারীর সুবিচার নিশ্চিত করা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে *'মহিলা সেবাসংঘ'র* সদস্যগণ প্রতিনিয়তই কাজ করে চলেছেন। তাদের নিরলস শ্রমেই গ্রামে সকল ধরনের বৈষম্য, নির্যাতন এবং সমঅধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার থাকেন এ সংঘের সদস্যরা।

ঘটনার নেপথ্যে

সুবিচার নিশ্চিতকরণে *'মহিলা সেবাসংঘ'*- এর পরিচালক বাহারজান আক্তার বলেন, "আমাদের সমাজে এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিয়ে করা মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনানুযায়ী ভরণ-পোষণ দিতে পারলে বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আগের (প্রথম) স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন। এলাকায় বিচারকার্যের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্ষতিপূরণ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং বিচার সুনিশ্চিতের বিষয়টিই বেশি প্রাধান্য পায়। কারণ সমাজে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সুবিচার সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। অসহায় নারীদের জীবন নানা ধরনের প্রতিকূলতা থাকে, কিন্তু তারপরও তারা থেমে থাকে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসাবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছি।

১৯৯৮ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করি। সে বছরই নারীর কল্যাণে কাজ করার জন্য গাজীপুরের বাঘিয়া গ্রামেই আট জন [বাহারজান, রওশন আরা কাজল, জাহেদা বেগম, সেলিমা, রহিমা, রেহানা, শাহিদা, শাহানাজ (মৃত)] নারীর উদ্যোগে গড়ে তুলি 'মহিলা সেবাসংঘ' নামে একটি সংগঠন। প্রথমত নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ থেকেই বৃক্ষ রোপন, সবজি চাষ, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি পালনের জন্য সদস্যদের প্রত্যেককে ঋণ প্রদান করা হয়। মহিলা সেবাসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। সংঘে গ্রুপ বা দল আছে ১১টি। প্রতিটি দল মাসিক সর্বনিম্ন পাঁচ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০ টাকা হিসাবে সঞ্চয় করে।

মহিলা সেবাসংঘটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং যৌতুকমুক্ত বিয়েসহ এলাকার নানা সমস্যায় সম্মুখীন নারীদের নিয়ে কাজ করা। এছাড়া বাঘিয়াবাসীকে সম্পৃক্ত করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, রোকেয়া দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসগুলো পালনের মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তোলা। আর এ সকল কাজের পেছনের ভিত্তিটি ছিল 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণটি। প্রশিক্ষণটি গ্রহণের পর থেকেই মূলত চিন্তা ও কাজের সহায়ক শক্তিটি মজবুত হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়েছি মূলত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক থেকেই। ঢাকায় মোহাম্মদপুরে কেন্দ্রিয় অফিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণের সুযোগটি আমার জীবনে একটি বড় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।"

বাহারজানের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট, প্রশিক্ষণটি তাকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে তাই তার মনে হয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির উন্নয়ন বিশেষ করে নারীর উন্নয়ন জরুরি। এজন্য সংঠগনের কোনো বিকল্প নেই। ফলে সাংগঠনিক কাজের প্রতি তিনি আরো বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এককভাবে কোনো কাজ করার চেয়ে সমন্বিতভাবে করলে তার ফল টেকসই হবে। এ ধারণা থেকে বাহারজান স্থানীয় অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে নারী অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসে সম্মিলিতভাবে আলোচনা সভা, র‍্যালিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকেন। এছাড়া জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী ও শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, বিষয়ক নিয়মিত উঠান-বৈঠক ও প্রচারণাধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। তিনি জানান, 'বাল্যবিবাহের মূল কারণ দারিদ্র্য আর সামাজিক মূল্যবোধ। ফলে বাল্যবিবাহ রোধ করতে গেলে এ দুটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে।' ২০০৭ সালে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কাজগুলো নিম্নরূপ:

নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক অনবর্তন (ফলোআপ) অর্জন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	স্থান	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অর্জন
১.	বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কর্মশালা	কোনাবাড়ী	২২	নারীদের এ সকল কাজে সম্পৃক্ত করা
২.	সিডর এ শীতবস্ত্র বিতরণ	বাগেরহাট এলাকায়	--	--
৩.	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে মসজিদের ইমামদের নিয়ে বৈঠক ও আলোচনাসভা	কোনাবাড়ি	১৮	সামাজিক কাজে তাদের সম্পৃক্ত করা
৪.	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, পারিবারিক পর্যায়ে নির্যাতন বন্ধে উঠান-বৈঠক এবং পেশাজীবীদের সঙ্গে	কোনাবাড়ি	১৭	প্রতিটি পরিবার পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করার অঙ্গীকার করে

	মতবিনিময়			
৫.	রোকেয়া দিবস পালন	কোনাবাড়ি	২৩	বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও কর্ম নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা।
৬.	বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনাসভা	বাঘিয়া, কোনাবাড়ী	১১৫	বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে বোঝানো ও সচেতন করা

এছাড়া বাহারজান তার নিজ কর্মগুণে সমাজের বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দিক নির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি Labour Resource Centre সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৩-২০০৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে ভূমিহীনদের সচেতন করা এবং তাদের সংঘবদ্ধ করার কাজটি করছেন। এছাড়া 'আলোকিত মানুষ', 'এনজিও ফোরাম'– গাজীপুর সদরে কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন।

বাঘিয়ার বাহারজানের নিজের কথা...

"বাবায় আমারে 'বাজান' কইয়্যা ডাকতো। চৌদ্দ বছর বয়সে বাবা মারা যান। আর তখন থেকেই আমার জীবন সংগ্রাম শুরু। সবাই চাইল বিয়ে দিতে। কিন্তু আমার ছোট ভাই-বোন ছিল। তাই দায়িত্বও ছিল। বাবা ওহাজউদ্দিন মণ্ডল একাধিক বিয়ে করেছিলেন। আমার মা বিলাতননেছা ছিলেন চতুর্থ স্ত্রী। আর পঞ্চম মা ছিলেন কর্পূরজান। কৃষিনির্ভর পরিবারে কোন অভাব-অনটন ছিল না। বড় পরিবারে যে বিষয়টি দেখেছি– কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ছিল না। সবসময় আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সবাই যে যার কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকতেন যে দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশই ছিল না। বাবা, দাদা সবাই ছিলেন গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে ব্যস্ত। বাবা বলতেন, ছেলে দূরে গিয়ে পড়বে কিন্তু মেয়ে? মূলত আমার দাদা নান্দু মণ্ডলের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীর সহায়তায় তিনি গড়ে তোলেন 'বাঘিয়া প্রাইমারি সরকারি বিদ্যালয়'। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। এরপর বাবার উদ্যোগ এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাঘিয়া উচ্চ বিদ্যালয়'।

সময় অনেকটাই গড়ায়। ১৯৬৪ সালে বাবার মৃত্যুতে কৃষি জমি দেখাশুনা এবং পরিবারে শূন্যতা দেখা দেয়। তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বাবার অবর্তমানে বড় সন্তান হিসেবে পরিবারে দায়িত্ব পালনেই সময় ব্যয় হত। তাই পড়াশুনায়ও বিরতি পড়ে। আমার দুই ফুপু এবং সহপাঠীরা ডিগ্রি পাশ করে অনেকেই শিক্ষকতা পেশা শুরু করে দিয়েছে। সে সময়ে আমার হতাশ মনে আশার সঞ্চার ঘটায় আমার ফুপু এবং সহপাঠীরা। আমার বাবা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বলতেন, 'মেয়ে আমার প্রফেসর হবে।' এটিই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। পরিবারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯৭২ সালে 'বাঘিয়া উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে ম্যাটিক পাশ করি।

এরপরই সাভার গণস্বাস্থ্যে কেন্দ্রে চাকরির সুযোগ আসে। সে সময় গণস্বাস্থ্যের পরিচালক বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করতেন। বাঘিয়া গ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজের সুযোগ মেলে। এখানে আমি স্বাস্থ্যসেবার কাজগুলো যেমন- শিশুর ছয়টি টিকা, মাতৃস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করতাম। এছাড়া নিজ দায়িত্ব থেকেই নারীদের স্বনির্ভর করার জন্য বাঁশ, বেত, সেলাই, বেকারি, পাদুকা তৈরি ও গিরিলের কাজ শেখানোর প্রশিক্ষণ দিতাম। এলাকা থেকে আমিই প্রথম চাকরি করেছি। তাই গ্রামে গেলে অনেকের অহেতুক কথা শুনতে হতো। তাদের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। সুদীর্ঘ সময় কর্মজীবনের পর ১৯৯৭ সালে অনেকটা ইচ্ছাকৃতই অবসর গ্রহণ করি। কাজের অভিজ্ঞতা ছিল বলে বিভিন্ন সংগঠন থেকে সুযোগ আসে। কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকি। আর সেরূপ ভাবনা থেকেই গড়ে তুলি একটি সংগঠন ('মহিলা সেবাসংঘ')। জীবন সংগ্রামে সর্বত্র স্বাধীনভাবে কাজ

করতে পেরেছি। চলার পথে কর্মজীবনের সহকর্মী ডা. লায়লা এবং ফ্রান্সের নার্স জিজেল ছিলেন আমার অনুপ্রেরণার উৎস।"

নতুন করে স্বপ্ন জাগায়

বাহারজানের স্বামী মোসলেম আলী গণস্বাস্থ্যের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষক হিসাবে বর্তমানে আফগানিস্থানে কর্মরত। ছেলে বায়েজিদ হোসেন ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের অনার্স ফাইনার ইয়ারের ছাত্র।

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টায় সফল হন নিজ তাগিদ থেকেই। প্রতিকূলতার কোন পরিস্থিতিতেই তারা দমে যান না। প্রতিনিয়তই ছুটে চলেন নতুন কিছু করার জন্য। 'হেই পাঁচটায় রওনা দিচি, ছয়টার আগেই সংসারের সব করচি; তাড়াতাড়ি যাইতে অইব বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নিয়মিত মাসিক সভায়।' সেদিন (৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) মোহাম্মদপুর কেন্দ্রিয় অফিসেই কথা হয় বাঘিয়ার বাহারজানের সঙ্গে। সময়মত মিটিং এ হাজির হওয়ার জন্য খুব ভোরে রওনা দিয়েছেন তিনি। নিজ তাগিদবোধ থেকে এই ছুটে আসার গল্প শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আস্থা বেড়ে যায়। বাহারজান আক্তার পরিশ্রম করেছেন, সুফলও মিলেছে তার। তিনি সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষায় যেভাবে কাজ করে চলেছেন তা আমাদের চলার পথকে প্রশস্ত করে; আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখায়।

নকশিকাঁথা: জীবনের রঙিন ফোঁড়

সরস্বতী রানী পাল

ঢাকার জুরাইন, মুরাদপুর এলাকা। জুরাইন রেলগেট থেকে রিক্সায় মুরাদপুর হাইস্কুল রোডের বিড়িফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি সংলগ্ন গলির পথ ধরে কিছুটা অগ্রসর হলেই *'নকশি কাঁথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'*টি অতি সহজে চোখে পড়ে। মুরাদপুরের ৮৪নং বাসার বাসিন্দা জেসমিনা সুরুজ জুঁই টিনের ঘরটি সজ্জিত করে তুলেছেন নানা হস্তশিল্পের কারুকাজের সম্ভারে। স্বামী সুরুজ এবং একমাত্র পুত্র জিমকে নিয়ে এখানে আছেন। এত কারুকাজ; তাও আবার এক হাতে করা! কীভাবে সম্ভব? অপেক্ষার মুহূর্তে দেখছিলাম তার তৈরি হস্তশিল্পের কারুকাজ। শুধু কাজ নয়; সাফল্যের স্বীকৃতিও পরিপূর্ণ করেছে তার সেই ঘরটি। এবার জানা যাক সেই জেসমিনা সুরুজ জুঁইয়ের কথা, যিনি এর সফল রূপকার।

স্বপ্নের রূপকারের জীবনকথা

পিতামো. আমির হোসেন ছিলেন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অফিসার এবং মা তাহ্‌মিনা হোসেন গৃহিণী। পাঁচ ভাই-বোনের সবাই উচ্চশিক্ষিত। তাই পরিবারে কোনো বিষয়ে অধিকার বঞ্চিত হওয়ার গল্প ছিল না। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঢাকায় থাকার পর পরিবারের সাথে চলে যান বরিশালের বেতাগীতে। বাবা ঢাকায় বদলি হন। তাই পরিবারের সাথে তিনিও চলে আসেন। ১৯৮৯ সালে রাজাপুর স্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৯১ সালে ফজলুল হক মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৯৩ সালে একই কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেন। এরপর সুযোগ ঘটে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়ার।

১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এমএ সম্পূর্ণ করেন। এ সময়ে তিনি চাকরির জন্য নানা জায়গায় যোগাযোগ করেন। একটি চাকরি মিলে যায় ব্র্যাকে। কর্মক্ষেত্র সোনারগাঁওয়ে মোটরসাইকেলে ঘুরে ঘুরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কাজ করতে হতো। জুঁইয়ের ভাষায়, 'মাস শেষে আর্থিক সচ্ছলতা আসত, কিন্তু আমি যা করতে চাই তা পারি না। এমন মনোভাব থেকেই সৃষ্টিশীল কিছু করার তাড়না অনুভব করি। তবে ব্র্যাকে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলাম, নারী প্রতিমুহূর্তেই কিছু করতে চায়; ।' তাই জুঁই নারীদের নিয়েই কিছু করার কথা ভাবলেন।

শিক্ষাজীবন থেকেই জুঁই মানসিকভাবে স্বনির্ভর জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ২০০৬ সালে পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ের পর তার সেই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ যেন আরও প্রশস্ত হয়। স্বামী সুরুজ তাকে বন্ধুর মত সার্বক্ষণিক সহায়তা করেন। আর তাই তার প্রতিভার শতভাগ বিকাশও যেন পরিপূর্ণতা পায়। জুঁই জানালেন, 'একজন নারী হিসেবে যখন নানান ব্যস্ততায় ছুটে চলতাম তখন অনেকের কাছেই তা পাগলামি মনে হতো। কিন্তু আমার স্বামী সুরুজ সকল কিছুর উর্দ্ধে আমাকে ছুটে চলার অনুপ্রেরণা দিতেন। এটি আমার জন্য অন্যরকম পাওয়া!'

বিয়ের পর শাশুড়ি তার গুণী জুঁই বউমাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। শাশুড়ির দৃষ্টিতে জুঁই ছিলেন একজন পরিশ্রমী পুত্রবধূ। শাশুড়ি তার গুণী বউয়ের কাছে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নিজেও কাজ শিখতেন। এটি ছিল জুঁইয়ের জীবনে অনেক বড় পাওয়া। এমনি করে জুঁইয়ের জীবন বয়ে চলে। ইতোমধ্যে তিনি প্রথম পুত্র সন্তানের জননী হন। একদিকে সংসার জীবন; অন্যদিকে কিছু করার ভাবনা তাকে বেশ তাড়িত করত।

নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন নতুন করে

২০০৮ সাল। ১-৩ মে। জুরাইনে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন জুঁই। সেটিই ছিল তার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা। এরপর তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তার আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথে যুক্ত হয় উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি। দি

হাঙ্গার বাংলাদেশ- এর ৩/৭ আসাদ এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত ১১০৯তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'তখন আমার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্য এক ধরনের টান অনুভব করি। তাই ছুটে যেতে ভালোই লাগত। প্রশিক্ষণের সবচেয়ে ভালো লাগা বিষয়টি ছিল- নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ। এছাড়া স্বর্নিভরতা, নয় বিন্দুর খেলা এবং স্বপ্নের গ্রামের ভাবনা যুক্ত করেছিল নতুন মাত্রা। চার দিনের অনেক জানা আর ভালো লাগার পরিধি থেকে তিনি যেন নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন নতুন করে। এরপর জুঁই নিজ উদ্যোগেই যুক্ত হয়েছেন ২০০৮ সালের ২৭-২৯ আগস্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে।

অতপর...

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর নিজের স্বর্নিভরতা অর্জনের পাশাপাশি এলাকায় বেশ কিছু কার্যক্রম শুরু করেন। নিজ ঘরেই শুরু করেন সেলাইয়ের কাজ। অন্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় খিলগাঁও পূর্ব গোড়ানে তিন দিন ব্যাপী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক ব্লক-বাটিক এবং হস্তশিল্পের উপর একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। স্থানীয় উজ্জীকদের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার আর্থ-সামাজিক বিশেষ করে নারীদের জন-সম্পদে পরিণত করা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ৩০ জন নারী উজ্জীবকদের প্রত্যেককেই ব্লক-বাটিকের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

নকশিকাঁথা

কাঁথার প্রতিটি ফোঁড়েই থাকে একেকটি দুঃখগাথা। সেই দুঃখগাথা দিয়েই পরিপূর্ণ হয় একেকটি নকশিকাঁথা। এরূপ ভাবনা থেকে কিছু করার দরকার অনুভব করেন জুঁই। ১৯৯৩ সালে ঘরোয়াভাবে গড়ে তোলা সেলাই শিক্ষা কেন্দ্রটির নাম দেন *'নকশিকাঁথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'*। অল্প ক'জন নারীকে নিয়ে জুঁই মুরাদপুর এলাকায় গড়ে তোলা সংগঠনটির শুরুর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানালেন, নারিন্দায় খালার বাসায় গায়ের মাপ দিয়ে খালা যখন পোশাক বানাতেন, তখন নিজের অজান্তেই কল্পনার জগতে তৈরি পোশাকটি দেখতে পেতাম। এছাড়া খালার বাড়ির প্রতিবেশী দীপালী ও শেফালী মাসিকে কাপড়ের ফুল বানাতে দেখে মুগ্ধ হতাম!'

শৈশবের স্বপ্নকে লালন করেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুঁই *'নকশিকাঁথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'*র মূল দায়িত্বটি পালন করে আসছেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা ও রুচিবোধের পরিবর্তন হয়েছে। তাই গ্রাম বাংলার প্রকৃতি থেকে শুরু করে বিয়ে, গায়েহলুদ, কনেবিদায়, কনেবরণ, গাছ-ফুল-পাতা-লতা-কলি, ধানক্ষেত, নৌকা, হালচাষ এরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত নকশিকাঁথা।

এছাড়া রয়েছে পোশাক তৈরি (কাটিং), কারচুপি, কাপড়ের পুতুল তৈরি, ফোমের শো-পিচ, জাপানি শো-পিস, জাপানি টাইডাই, বাটিক প্রিন্ট, কারু মোম, ভেজিটেবল ডাইং, ব্রাশ প্রিন্ট, স্প্রে প্রিন্ট, ড্রাই ফুল, কাপড়ের তৈরি ফুল, আর্টিফিসিয়াল বনসাই, ভেজিটেবল কাটিং, ক্রিস্টালের শো-পিস, হাজার বুটি, ঝাড় বাহার, স্টোন ট্রি, চায়না পটারি, ডায়মন্ড পটারি, গ্লাস পেইন্ট, গ্রিটিং কার্ড, চুড়ি বাহারি, চট বাহারি রাজ পটারি, পাউরুটি শো-পিস, এম্ব্রয়েডারি, কোরিয়ান ফুল, টিস্যু ও পেপার ক্রাফট, রিবন ক্রাফট ও রাজশাহী সিল্ক, গোল্ডেন সিরাডিক প্রিন্ট, ইরানি পটারি, রাজ পটারি, আড়ং -এর কুসন কভার, রজনীগন্ধা স্ট্রিক, সাবানের শো-পিস, ফুল, পুঁতি-পার্বণ, কৃত্রিম মাশরুম, তেজপাতার গাছ, নাইট কুইন, থাই কুইন, সাবানের ফালুদা, সিরামিক প্রিন্ট, হ্যান্ড প্রিন্ট, ব্লক-বাটিক, ডিমের খোসার শো-পিচ, কন-ফ্লায়ার, কাঁচের ফুলদানিসহ প্রায় ২০০ রকমের আইটেম। এগুলো সবই জুঁইয়ের তৈরি।

নকশিকাঁথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুধু হাতের কাজ নয়, রান্না বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রান্নার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিষ্টি, আইসক্রিম, বেকারি, চাইনিজ, কেক ইত্যাদি অন্যতম। নকশিকাঁথা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এ পর্যন্ত ৪৫ জন নারী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। কাজের সুবাদে বাড়তি আয়ের পথ অনেককেই দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান। এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। এখানে নিয়োজিত স্বাবলম্বী নারীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সংসারে কাজের ফাঁকে এই বাড়তি আয় তাদের স্বাবলম্বী করেছে। দিয়েছে জীবনে নতুন পথের সন্ধানও। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার এই আয়োজনের চলমান প্রক্রিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

যুক্ত আছেন আরো যে সকল কাজে

নারীকে শতভাগ স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমেও রয়েছে তার নিয়মিত অংশগ্রহণ। আরটিভি'র গৃহশৈলী'তে (পাক্ষিক/প্রতি বৃহঃ) হস্তশিল্পের উপর প্রচারিত অনুষ্ঠানে জুঁই নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। প্রচারের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যই তার এই মহতী উদ্যোগ। এছাড়া ২০০২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পিডিলাইট কোম্পানির সাধারণ সম্পাদিকা এবং একজন প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। নারী অধিকার নিয়ে তিনি আফ্রিকার সাবেক ফাস্টলেডি উইনি মেন্ডেলার সাথে তার এলাকার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। মূলত সে আলোকেই তিনি এলাকায় সার্বক্ষণিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছেন। এছাড়া 'আলোকিত মানুষ, আলোকিত নারী' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে নির্যাতিতা নারীদের সাথে কাজ করছেন *'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসে ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)'*।

সাফল্যের স্বীকৃতি

নারীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে একদিকে সফল প্রশিক্ষকের স্বপ্ন; অন্যদিকে তার সকল কর্মতৎপরতার জন্যই এলাকাবাসী জুঁইকে সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। আর সেই সাফল্যের অনুপ্রেরণা থেকেই জুঁই কোতোয়ালি ইউনিট থানা থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আহ্বানে এবছর 'জাতীয় যুবমেলা-২০০৮'-এ অংশগ্রহণ করেন। সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা ও সনদপত্র মিললেও মেলেনি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার। নারীকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কাজ করতে হয়। আত্মবিশ্বাসী জুঁই তার নানামুখী কর্মকাণ্ডের গুণে আগামী বারে এই পুরস্কারটি পাওয়ার জন্য মনে মনে প্রত্যাশা করেন। আর তাই জুঁই নব নব সৃষ্টিশীল ভাবনা নিয়ে ছুটে চলার তাড়াও অনুভব করেন।

স্বাবলম্বী জুঁইয়ের স্বপ্ন

অনেক দিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে জুঁই বলেন, 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ফলে এটিকে বাস্তবায়নের জন্য নিজ এলাকাতেই কাজ করে চলেছি।' এলাকার জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ যেমন, ব্লক-বাটিক, সুঁচিকর্মসহ হস্তশিল্পের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে চলেছেন জুঁই।

অন্যরকম স্বপ্নের সফল রূপকার...

জুঁইয়ের শৈশব স্বপ্নের অনেকটা অংশ জুড়েই যে গল্পটি খুব বেশি অনুপ্রাণিত করে তোলে– বরিশালের সিকদার বাড়ির সুশ্রী মেয়ের (জুঁইয়ের দাদী) তৈরি নকশিকাঁথা দেখার জন্য অনেক দূর থেকে মানুষেরা আসতেন। দাদা শীতের দিনে চাদরের পরিবর্তে দাদীর তৈরি নকশিকাঁথাটি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তখন থেকেই মূলত রূপকথার কাহিনীর মত সুন্দর কারুকাজের কাঁথা মনে আঁকা ছিল। বাবার কাছ থেকেই সেই গল্প বার বার শুনতেন। জুঁইয়ের কাছে তা প্রতিবারই নতুন মনে হতো। সত্যি তাই! জুঁইয়ের সেই গল্প যেন তার শুধু একার নয়; আমাদেরও।

ইভানের কথা

সরস্বতী রানী পাল

বাড়িতে যখন বেশ ধুমধাম করে বড় বোনের বিয়ের আয়োজন চলছিল; তখন তাকে থাকতে হয়েছিল আড়ালে-আবডালে। বুঝতে পারেন তিনি আর সবার মত নন! তিনি তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ। নিজেকে লুকিয়ে রাখার ঘটনাটি শৈশবস্মৃতিতে তাকে অনেক বেশি তাড়িত করত। পরিবারের কেউ তার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ পর্যন্ত করত না। ফলে কেমন যেন এক বিভ্রান্তিকর শৈশব কাটে তার? শৈশবস্মৃতির এই কথা প্রতি মূহুর্তেই কষ্টের কারণ। তবে পড়াশুনার ব্যাপারে পরিবারের কারো কোনো আপত্তি ছিল না। এটিই ছিল প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে ইভানের শৈশবের সবচেয়ে বড় দিক।

ইভান আহাম্মেদ কথা। জন্ম ১৯৬৮ সালের ১০ জুলাই ঢাকার বড় মগবাজারে। বাবা মরহুম আমির উদ্দিন আহাম্মেদ ছিলেন খিলগাঁও রেলওয়ের কর্মকর্তা। মা রোজিয়া আহাম্মেদ বেলা গৃহিণী। ছয় ভাই-বোন নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল আট জন। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারে শৈশবে অভাব-অনটনের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু ইভান ১৯৭৫ সালে খিলগাঁও প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৮৯ সালে মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৯১ সালে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র ইভানের ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল, ডাক্তার হবেন। কিন্তু সময়ের নানা প্রতিকূলতায় সে স্বপ্নপূরণ হয়নি। এরপর আর পড়াশোনা অগ্রসর হয়নি। ইভান সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পারদর্শী হওয়ার জন্য নিজেকে গড়তে শুরু করেন। তিনি নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি 'বাফা' থেকে তিন বছরের নৃত্যের একটি কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি অন্যকে নাচের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এছাড়া স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

বদলে যাওয়া ইভান

স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাননি বলেই হয়তো নিজ চেষ্টার গুণে ইভানের এগিয়ে চলা। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত, তিনি আর সবার মত স্বাভাবিক নন। নানা ধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যেকে তিনি সর্বদা দূরে ঠেলেই পথ চলেছেন। আর তাই সাফল্যও তাকে স্পর্শ করেছে। যতটা প্রত্যাশা তার চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অনেকবেশি প্রাপ্তি ঘটেছে তার।

'বিকশিত নারী নেটওয়ার্কে'র প্রশিক্ষণটিই মূলত একজন মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে তাকে অনেক বেশি শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ- এর মোহাম্মদপুর কেন্দ্রিয় অফিসে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ১৯তম ব্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। ২৯-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অনেকটা ভয়ে ভয়েই অংশগ্রহণ করি। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে শুরুর সেই ভয়টি আর থাকে না। প্রশিক্ষণে বুঝতে সক্ষম হই যে, কেউ কারো উন্নয়ন করে দিতে পারে না। নিজের উন্নয়নের জন্য নিজকেই কাজ করতে হবে। হীনমন্যতা নয়, বরং মানুষ হিসাবে এগিয়ে যেতে হবে। জানতে পারি– প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে দায়বদ্ধতা ও উপলব্ধিবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে এক ধরনের চেতনা যেমন- মানুষ পারে, সে সক্ষম, সৃজনশীল, মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সক্ষম, যার সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক দায়িত্ব তার নিজের এ চেতনাবোধ জেগে ওঠে। প্রশিক্ষণে জেন্ডার ও সেক্স সম্পর্কে ধারণাটি স্বচ্ছ হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন পর্বটি মুগ্ধ করে।'

প্রশিক্ষণে সমান অংশীদারিত্বের সুযোগই ইভানকে বদলে দেয় অনেকখানি। শুধু বদল নয়, সার্বিক পরিবর্তনের ছোঁয়া তাকে দিল একজন মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ। তার ভাষায়, 'সিদ্ধান্ত নেওয়া, ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা অর্জন মূলত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণ থেকেই পাওয়া। প্রশিক্ষণে মানবিক সত্তাটি যেন খুঁজে পেয়েছি। মূলত

মানুষের ভেতরের ধৈর্যশক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সেই প্রশিক্ষণে। সেখানে কোনো বিষয়ে বৈষম্য কিংবা কারো কোনো নেতিবাচক অথবা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। ফলে নিজেকে প্রকাশ এবং তুলে ধরার অবারিত দ্বার ছিল।'

ইভান প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে যান গাজীপুরের পাতাকুড়ে বোনের বাড়িতে। সেখানেই মূলত তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন তার নানামুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এলাকায় ফিরে গিয়ে পরিবর্তিত ইভানের মনে হয়েছে, 'পূর্বে অনেকেই আমাকে দেখে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলত; পেছন ফিরে কথা বলত; উস্কানিমূলক নানা উক্তি করত। এমনি একটি সামাজিক পটভূমিতে ইভান তার যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'আসলে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নাম এবং পরিচয়ের পরিপূর্ণ স্বীকৃতিটি পেয়েছি প্রশিক্ষণ থেকেই।'

ইভানের জীবনে এরপরের কথাগুলো শুধুই এগিয়ে চলার পদক্ষেপ। জীবন সংগ্রামের শুরুতে কিছু একটা করার তাগিদে তিনি প্রাথমিকভাবে গড়ে তুলেছিলেন *'সচেতন'* নামে একটি সংগঠন। ধীরে ধীরে সেটিরই বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেন।

সচেতন শিল্পী সংঘ

১৯৯৯ সালে *'সচেতন শিল্পী সংঘ'* নামে গড়ে তোলা সংগঠনের কার্যক্রমের পরিধি বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে পরিধির সঙ্গে বাড়তে থাকে এর সদস্য সংখ্যা। 'আমার সংস্কৃতি আমার অধিকার'- এই স্লোগানে সংগঠনের ৪৫০ জনের সবাই *'তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ' (হিজড়া)*। মূলত 'তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ'কে নিয়ে কাজ করার জন্যই *'সচেতন শিল্পী সংঘে'*র যাত্রা শুরু হয়েছে। বর্তমানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ১৪১৭/১-এ, ব্লক-১ খিলগাঁও, তালতলাতে। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশেই রয়েছে উক্ত সংগঠনের নানামুখী কার্যক্রম। সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো, যে কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধরনের তৃতীয় প্রকৃতির ব্যক্তি এর সদস্য হতে পারবেন। সমগ্র বাংলাদেশের হিজড়াদের সকল ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই নয়, স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উক্ত সংগঠনটি *'ঢঙ'* নামে একটি বুটিক শপ গড়ে তোলে। খিলগাঁও তালতলা মার্কেটে হস্তশিল্পের এই দোকানটি অতি অল্প সময়েই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই মাত্র দুই বছর সময়ের মধ্যে অনেকেই এখান থেকে স্বাবলম্বীর হওয়ার পথও তৈরি করে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত সংগঠনের আর্থিক ব্যয়ে দশ জনকে আত্মনির্ভরশীল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়না, রবি, কাজল, সবুজ, মাসুম, বিপ্লব, খুশী, ঝিনুক, কামরুলসহ অনেকেই তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা চেতনা থেকেই কাজ করছেন। প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণকালীন কাজের দক্ষতা মুল্যায়নের প্রেক্ষিতে ন্যূনতম খরচ দেওয়া হয়ে থাকে। ব্লক-বাটিক, কারচুপি, এমব্রয়ডারি প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া নেই। তবে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সময়োপযোগী কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। প্রতিভা অনুযায়ী তাদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এটি হচ্ছে *'সচেতন'*-এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ ধরনের সংগঠন শুরুর প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে *'ঢঙ'*- এর পরিচালক তুহীন উদ্দীন খান নদী জানালেন, 'আমরা অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষ। কোথাও আমাদের স্বীকৃতি নেই। তাই নিজেরাই গড়ে উঠতে সক্রিয় হয়েছি। অন্যদেরও সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে চলেছি।' *'সচেতন'*- এর আরেকটি কার্যক্রম ঢাকার গেন্ডারিয়ায় অবস্থিত 'বনফুল' নামে বিউটি পার্লারের পরিচালক মিল্লাত আলি (ঝিনুক) জানালেন, 'থার্ড জেন্ডারকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই সচেতন সংঘের নানামুখি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। *'সচেতন'*- এর প্রথম কাজই হলো মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করা, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয় সেজন্য সোচ্চার ভূমিকা রাখা। এছাড়া তৃতীয় প্রকৃতির মানুষের কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পথ নাটক, জারি, পালা গান, যাত্রার মাধ্যমে বিষয়গুলো অধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।'

উল্লেখ্য, এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইভানের স্বরচিত বেশ কিছু নাটক ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে। তার রচিত মানবাধিকার বিষয়ক নাটক *'না'* নারী দিবসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এছাড়া হিজড়াদের জীবন নিয়ে *'অবহেলা'*, *'স্বীকৃতি'*, *'বন্দি'*সহ এ পর্যন্ত কুড়িটি নাটক রচনা এবং মঞ্চে পরিচালনা করেছেন তিনি। যুগোপযোগী এবং অধিকারভিত্তিক এ সকল নাটক নানান সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইভান সমাজের নানা বৈষম্য, অত্যাচার, নির্যাতন ও তার প্রতিবাদ বিষয়ে নাটক রচনা এবং তা মঞ্চায়নের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

সম-মর্যাদার মানুষ হিসেবে চাই স্বীকৃতি

সকল সংগঠনে সম-মর্যাদার মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। তাই 'নারী' ও 'পুরুষ' এই শ্রেণির পাশাপাশি যেন তাদেরও মর্যাদা দেওয়া হয়। ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে যেন তাদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। ইভান আহমেদ বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব দান ইত্যাদি অধিকারগুলো যেন আর সবার মতই অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে তাদের ভোটারাধিকারের সুযোগ থাকবে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, সমাজ সব সময় শক্তিমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই সকল সামাজিক বৈষম্য দূরে ঠেলে মানুষ হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমরা সোচ্চার ও প্রতিবাদী হতে চাই। পেতে চাই সমান সুযোগ, হয়ে উঠতে চাই প্রকৃত অর্থেই একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

হতে চাই বিশ্বশান্তির দূত

ইভান আহাম্মেদ মহীয়সী মাদার তেরেসার আদর্শে অনুপ্রাণিত। যিনি সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। *'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'(Missionaries of Charity)* নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ইভানও তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন মনে মনে লালন করেন। শুধু লালন নয়, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি শুরুও করেছেন একটি ক্ষুদ্র সংগঠন। ডেমরার মানিকদিতে *'কথাকলি শিশু কিশোর সংগঠন'* নামে সংগঠনের মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। এটি বর্তমানে স্কুল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া তেরেসার সেই *'নির্মল হৃদয়ঘর'* শীর্ষক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বাসনাও তিনি লালন করেন। যেখানে জাতি, লিঙ্গ কিংবা ধর্ম বা বর্ণের কোন ভেদ থাকবে না।

ইভান দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, এবং ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন পুরুস্কার, সম্মাননা এবং সনদপত্র। তিনি প্রমাণ করেছেন, কাজই মানুষের প্রধান পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয় নয়। ইভান চান, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ যেন চিরকালের জন্য নির্বাসিত হয় এবং বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের প্রচলিত সমাজ বাস্তবতায় নানা প্রতিকূতার মধ্যেও ইভান নিজেকে তুলে ধরেছেন এবং আলোকিত করেছেন নিজস্ব জগতকে। তাই 'নারীর কথা'য় সেই ব্যতিক্রমী মানুষের জীবনালেখ্যটি তুলে ধরা হলো।

-সমাপ্ত-